প্রত্যয়

এপ্রিল-জুন ২০২১ • সংখ্যা-২৫ • বর্ষ-৬

ক্ষুদ্র অর্থায়ন
সংখ্যা

BURO
Bangladesh

এপ্রিল-জুন ২০২১ • সংখ্যা-২৫ • বর্ষ-৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস লি.

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

প্রোডাকশন
মেসার্স অঞ্জলি.কম

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

স্বনির্ভর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক

১৯৭১ সাল থেকে ২০২১। দেখতে দেখতে বাংলাদেশ এর বয়স ৫০ বছর হয়ে গেছে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই পঞ্চাশে এসে কতোদূর এগিয়েছে বাংলাদেশ? স্বাধীনতা অর্জন মুহূর্তে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশ। বর্তমানে এই হার নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৪ শতাংশে। ১৯৭২ সালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩ শতাংশ এখন তা ৫০ শতাংশের উপরে। ১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ ডলার, বর্তমানে তা ২২২৭ ডলার। এখন আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে রয়েছি। মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ডলারে উন্নীত হলেই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবো।

একাত্তরে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ১৮%, বর্তমানে শিক্ষার হার ৭৬% এর উপরে। স্বাধীনতা পূর্ব সময় হতেই দেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি ছিল। তদুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অসংখ্য মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। এমনকি না খেতে পেয়ে অনাহারে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করতো। আশার কথা, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কৃষি খাতের পাশাপাশি শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এ দেশের পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে দাপটের সাথে প্রাধান্য রক্ষা করে চলেছে। পোশাক শিল্পেই প্রায় ৪২ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫৮% নারী। পোশাক রপ্তানির দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। এ দেশের ১ কোটি ২০ লাখেরও অধিক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসুবাদে অবস্থান করছে। তাদের প্রেরিত বৈদেশিক রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ২৫ বিলিয়ন ডলার ও রপ্তানি আয় এসেছে ৩৯ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, ২০২০ সালে বিশ্বের ৮ম শীর্ষ প্রবাসী আয় প্রবাহ এসেছে বাংলাদেশে। জিডিপি'র হিসাবে বাংলাদেশ ২০১৯ সালেই বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। ক্রয় ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বে এ দেশের অবস্থান ৩৩তম। আশা করা হচ্ছে ২০৩৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের এই অভাবনীয় উন্নয়নের পেছনে এনজিও/এমএফআই খাতের অবদানও ব্যাপক। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন ধরনের বৃহত্তর প্রকল্প ও কর্মসূচি, কৃষি, শিল্প, ভৌত অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দেশের এনজিও/এমএফআই সেক্টরের তৃণমূল পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই সাফল্যকে আরো বেগবান করেছে। অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে এমএফআই সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ খাতে কর্মরত রয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজারেরও অধিক শিক্ষিত কর্মী, এ সেক্টরে ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকারও বেশি। এর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থায়ন ধরলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। জিডিপিতে এমএফআই খাতের অবদান প্রায় ১৪%। এ খাতের মাধ্যমে দেশের ৩ কোটি ২৫ লাখ পরিবারকে আর্থিক সেবার মধ্যে আনা হয়েছে যাদের মধ্যে ৯৬% মহিলা। দেশের ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন।

দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই এনজিও/এমএফআই খাতের কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আর্থিক এবং কাঠামোগতভাবে সক্ষম এমএফআইদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা জরুরি। অন্তত একাধিক না হলেও সক্ষম ৮/১০টি এমএফআইকে যৌথভাবে একটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান করা হলেও দেশের অর্থনীতি উল্কার মতো গতিশীল হবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, গ্রামের মানুষের হাতে এখন অর্থের ব্যাপক প্রবাহ বিদ্যমান। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে মাত্র ৫০ শতাংশের ব্যাংক হিসাব রয়েছে যাদের অধিকাংশই শহরাঞ্চলের। সেক্ষেত্রে এমআরএ'র নিবন্ধিত ৭৪৬টি এমএফআই এর দেড় লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এক্ষণে এমএফআই সমূহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক অন্তত ৯০% মানুষ ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাবে। এতে একদিকে যেমন দেশে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক-ঋণ খেলাপিমুক্ত অবস্থানে থেকে বর্তমানের চেয়ে ১০ গুন ঋণ সুবিধা দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে সক্ষম হবে। প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ।

পরিশেষে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে সুরক্ষায় থাকতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ করে নিরাপদ দূরত্ব, মাস্ক ব্যবহার ও ঘন ঘন সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রত্যয়
ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংখ্যা

শুধু উন্নয়ন নয়, টেকসই উন্নয়নের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। বদলে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সাথে এনজিও/এমএফআইগুলোর অবদানও ব্যাপক ও সুদৃঢ়।
সে প্রেক্ষিতেই 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন : টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রচ্ছদ নিবন্ধ লিখেছেন বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও এফএনবি'র চেয়ার **জাকির হোসেন**।

পাশাপাশি ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জ বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন বুরো বাংলাদেশ এর পরিচালক অর্থ **এম. মোশাররফ হোসেন**।

দেশের অর্থনীতিতে এনজিও/এমএফআইগুলোর অবদান এবং প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে **প্রত্যয়**কে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন–
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর **ড. আতিউর রহমান**
এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান **মো. ফসিউল্লাহ**
আইএনএম'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর **ড. মোস্তফা কে. মুজেরী**
আশা'র প্রেসিডেন্ট **মো. আরিফুল হক চৌধুরী**
পপি'র নির্বাহী পরিচালক এবং সিডিএফ এর চেয়ারম্যান **মুর্শেদ আলম সরকার**
ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক **সাজ্জাদ জহির**
সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক **আবদুল আউয়াল** এবং
আইএনএম'র অনারারী অ্যাডভাইজার **সাব্বির আহমেদ চৌধুরী**।

সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন
প্রত্যয় সম্পাদক **ফেরদৌস সালাম** ও নির্বাহী সম্পাদক **বিদ্যুত খোশনবীশ**

ক্ষুদ্র অর্থায়ন : টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

জাকির হোসেন

অর্থনৈতিকভাবে ক্রমাগত সামনের দিকে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে সরে এসে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের চলতি ধারা অব্যাহত থাকালে অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আজ যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এর পেছনে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও/এমএফআই খাতের ক্ষুদ্র অর্থায়ন বড় ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে দেশের স্থিতিশীল টেকসই উন্নয়নে ক্ষুদ্র অর্থায়নের অবদান উল্লেখ করার মতো। এই ক্ষুদ্র অর্থায়ন বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ক্রয় ক্ষমতার দিক থেকে এদেশের অবস্থান ৩৩তম। আশা করা হচ্ছে ২০৩৩ সালের মধ্যে আমরা বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করবো। বাংলাদেশের এই দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নের অনেক চালিকাশক্তির মধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এ দেশে প্রথম পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের কর্ম সুযোগ দেশকে উন্নয়নের ট্র্যাকে যুক্ত হতে সহায়ক হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে, দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশসহ ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করছে। এতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে– যা দেশকে এনে দিচ্ছে টেকসই উন্নয়নের ধারা। বর্তমানে এদেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২২৭ ডলার। ১৯৭০ সালে যা ছিল মাত্র ১০০ ডলার।

দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর একটি। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। বন্যা, খরা, উপকূলীয় ঝড়-জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে লেগেই থাকতো। সেই সাথে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ বঞ্চনার কারণে এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা দূরের কথা, দু' বেলা দু' মুঠো ভাত ও পরিধানের বস্ত্র জোগাড় করাই ছিল অধিকাংশ মানুষের জন্যে কষ্টকর। অনেক মানুষকেই তখন একবেলা অর্ধবেলা অনাহারে থাকতে হতো। বাসস্থান বলতে গ্রামগুলোতে চোখে পড়তো শুধু কুঁড়েঘর আর কাচা ঘরবাড়ি। এমনই এক আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক হানাদারদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে এ দেশের এক

কোটিরও অধিক মানুষ শরণার্থী হিসেবে প্রতিবেশি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মহান স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর তারা ফিরে এলে পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময় সরকারের পাশাপাশি স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর নেতৃত্বে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ব্র্যাক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগণের পুনর্বাসনে কাজ শুরু করে। স্বাস্থ্য কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসেন ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত জমিতে ঢাকার অদূরে সাভার উপজেলায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। পরবর্তীতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামীণ ব্যাংক। তাদের এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আশা, বুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএস, এসএসএস, জেসি ফাউন্ডেশন, সাজেদা ফাউন্ডেশন, পদক্ষেপ, উদ্দীপন, শক্তি ফাউন্ডেশন, আইডিএফ, ঘাসফুলসহ আরো অনেক ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এ পর্যন্ত ৭৪৬টি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাকে সনদ প্রদান করেছে। দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত স্যানিটারি ব্যবস্থা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সকল এনজিও এবং এমএফআই এক যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এসব সংস্থা দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে মোট দেড় লাখ কোটি টাকারও অধিক ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছে– যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এর ফলে বাংলাদেশের এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক

দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশীয় যে প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কিংবদন্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেটি ব্র্যাক– যার প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব মরহুম স্যার ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও দারিদ্র্য নিরসনসহ সমাজ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও বাধাবিপত্তি দূর করার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে পুনর্বাসন কাজ শুরু করলেও ১৯৭৪ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ চালু করে।

এরপরই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস হতদরিদ্র, সহায়সম্বলহীন মানুষদের ভাগ্যোন্নয়ন ও তাদের আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, এই মানুষগুলো অসহায় কারণ তাদের নগদ টাকা নেই। আর নগদ টাকা ছাড়া তারা নিজেরা কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিতে পারছে না। এই চিন্তা থেকেই তিনি তাদের জন্যে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করলেন যা পরবর্তীতে গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

ব্র্যাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র অর্থায়নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাদের পথ ধরেই পরবর্তী পর্যায়ে ৮০'র দশকে বাংলাদেশে ছোট বড় অসংখ্য এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদীর্ঘ সময়ের কার্যকর ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। দরিদ্র মানুষগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়ায় উন্নয়ন ঘটে মানবিক জীবন যাপনেরও। বাংলাদেশ খুঁজে পায় স্বনির্ভরতার গুরুত্বপূর্ণ পথ।

ক্ষুদ্রঋণের ইতিহাস

ক্ষুদ্রঋণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট যে এদেশে ক্ষুদ্রঋণের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এ দেশকে বলা যায় ক্ষুদ্রঋণের রোল মডেল। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পাল্টে দিয়েছে, দেশের অর্থনীতিকে একটা স্থিতিশীল ধারায় পরিচালিত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের সিঁড়িতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে যার পেছনে ক্ষুদ্র অর্থায়নের অবদান ব্যাপক। এই ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার পরে শুরু হলেও দেখা যায় জমিদার ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলার প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও মহাজনী শোষণের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও নওগাঁর পতিসরে কৃষি ঋণ বিতরণ করেছেন। এজন্যে তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৯৪ সালে শিলাইদহে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের জন্যে স্বল্প সুদে ঋণের সুযোগ সৃষ্টি। ১৯০৫ সালে তিনি পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন যার নাম অনেক জায়গায় কালীগ্রাম কৃষি ব্যাংক বা সমবায় কৃষি ব্যাংক নামে উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে বাংলাদেশ অঞ্চলে তার এই উদ্যোগকেও ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর একজন অবাঙালি আইসিএস অফিসার ড. আখতার হামিদ খান সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়নের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তার সেই মডেলকেই কাজে লাগিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কুমিল্লায় Pakistan Academy for Rural Development (PARD) প্রতিষ্ঠা করে যা স্বাধীনতার পর Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) এ রূপান্তরিত হয়। অবশ্য কুমিল্লা মডেলের এই সমবায়ী ঋণ জাতীয় পর্যায়ে কৃষি এবং কৃষকদের উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখলেও ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণ এ মডেলের আওতার বাইরে ছিল।

এমনকি সরকারের প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবর্তিত কৃষিঋণও গ্রামের বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছেনি। কারণ কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে তাকে যার কৃষি জমি রয়েছে। অবশ্য প্রায় দু'দশক ধরে এর উত্তরণ ঘটিয়ে বর্গাচাষীদের জন্যেও এই ঋণ চালু করা হয়েছে। এসব কারণে দেশে এসব কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও সে সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমেনি।

এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণের জন্মভূমি। স্বাধীনতার পর বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ফজলে হাসান আবেদ এবং তাঁর বন্ধু ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে সিলেট অঞ্চলের ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগের কথা ভাবলেন। তারা হিন্দু অধ্যুষিত শাল্লায় গিয়ে দেখলেন অনেক গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, ঘরবাড়ির অস্তিত্ব নেই। ফজলে হাসান আবেদ মুক্তিযুদ্ধকালে অ্যাকশন বাংলাদেশ ও হেলপ বাংলাদেশ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কাজ করে আসছিলেন। এবার তারা স্বাধীন দেশের দরিদ্র, অসহায়, সব হারানো মানুষের পুনর্বাসনের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠা করলেন Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC)। পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)। স্যার ফজলে হাসান আবেদ লন্ডনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে পাওয়া ৬৮০০ পাউন্ড এবং ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীর নিকট থেকে পাওয়া ভারতীয় ২৫ হাজার রুপি নিয়ে শাল্লার মানুষের জন্যে যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু করেন মূলত সেটি অর্থাৎ ব্র্যাকই ছিল বাংলাদেশের প্রথম এনজিও।

এ সময়টিতেই আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাভারে প্রতিষ্ঠা করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার দুই প্রতিষ্ঠান দিয়েই বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের এনজিও'র যাত্রা শুরু। তারপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূস এর গ্রামীণ ব্যাংক। এটি শুরুতে এনজিও হলেও পরবর্তীতে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালনকারী ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর ব্র্যাক শুরুতে সুনাগমঞ্জের দিরাই ও শাল্লায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করলেও ১৯৭৪ সালে তিনি ব্র্যাক এর মাধ্যমে এ এলাকার জেলে ও চাষীদের দাদনমুক্ত করতে ক্ষুদ্রঋণ চালু করেন। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে দাদনগ্রস্থ কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের পরীক্ষামূলক ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিশাল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। বর্তমানে দেশে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, সাজেদা ফাউন্ডেশন, আরডিআরএস, শক্তি ফাউন্ডেশন, এসএসএস, পপি, জাগরণী চক্র, উদ্দীপন, টিএমএসএস, এসকেএস-গাইবান্দাসহ সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রকল্পের সাফল্য এবং প্রায় অনুরূপ মডেলে পরিচালিত এসব মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের এ মডেল অনুসরণ করছে এবং দরিদ্র মানুষের অধিকার অর্থাৎ দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে মাত্র ৮৫৬ টাকায় শ্রম দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল জোবরা গ্রামের ১২ জন কর্মোদ্যোগী শ্রমজীবী নারী। বদলে গিয়েছিল তাদের জীবনধারা। এদেশে সামান্যকে ক্ষুদ্র বলা হয়। যেহেতু সামান্য পরিমাণ টাকা ঋণ পেয়ে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষগুলোর মুখে উন্নয়নের হাসি এসে যোগ হয়, ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে– তাই এর নাম হলো 'ক্ষুদ্রঋণ'।

ক্ষুদ্রঋণ : উন্নয়নের নতুন আলো

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী মহাজনী শোষণের শিকার হয়ে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হতে থাকে। বাড়তে থাকে দারিদ্র্যের সীমা। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর দেশে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে জীবন ধারনের জন্যে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ ভাত কাপড়

যোগাড়সহ সন্তানের পড়াশোনা, বিবাহ ও চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর জন্যই মহাজনের কাছে কড়া সুদে ঋণবন্দি হতে থাকে। তখনকার বাস্তবতায় দেশের দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ঋণ দেয়ার কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না। ব্যাংকগুলোও চাল-চুলোহীন দরিদ্র মানুষকে কোনো ঋণ দিত না। ঠিক সে মুহূর্তে এনজিও এবং এমএফআই সেক্টরের ক্ষুদ্রঋণ তাদের জন্য সূর্যালোকিত ভোর হয়ে আসে। নিজেদের টিকে থাকা ও বেঁচে থাকার আশ্রয়ই শুধু নয়, উন্নয়নের শক্ত ভিত হিসেবেও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আসে সুসংবাদ।

দরিদ্ররা এখন অর্থনৈতিক শক্তি

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ছিল ৮০%। ১৯৭৪ এ ৮২%, ১৯৮২ সালে ৭০%, ১৯৯২ এ ৫৮%, ১৯৯৬-এ ৫১%, ২০০০ সালে ৪৮.৯%। ২০০৪ সালে তা ছিল ৪২%। ২০১০ সালে ৩১.৫%, ২০১৭ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২৪.৩%। বর্তমানে এই হার ২৪% এর নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে ১৯৭২ সালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩%, ২০১৭ সালে তা দাঁড়ায় ৪০% এর উপরে। বর্তমানে এই হার ৫০% এ দাঁড়িয়েছে। নারীদের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই এসেছে তাই নয়, সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের আরো অনেক শিল্প ব্যবসা ও উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। তবে এর পেছনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকাই বেশি। কারণ, ক্ষুদ্রঋণ শুধু আত্মকর্মসংস্থানেরই সুযোগ সৃষ্টি করেনি, ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল দেশের বোঝাস্বরূপ, সেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীই এখন অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে ক্ষুদ্রঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে অতি দ্রুতই কমে আসছে দারিদ্র্যের পরিমাণ।

গ্রামীণ মডেলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ চালু করে। তাদের এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এ পর্যন্ত ৭৪৬টি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাকে সনদ প্রদান করেছে। দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সকল এনজিও এবং এমএফআই এক যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এসব সংস্থা দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে মোট দেড় লাখ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছে– যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

গ্রামীণ মানুষের এক বিশাল অংশ এখনো ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক সেবার বাইরে রয়ে গেছে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে মাত্র ৫০ ভাগের ব্যাংক হিসাব রয়েছে। মোট জনসংখ্যার নারীদের ৩৫.৮ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবায় সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। ২১.২ শতাংশ জনগণ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। ৯.৯ শতাংশ মানুষের আর্থিক

প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় রয়েছে এবং ঋণ রয়েছে ৯.১ শতাংশ ব্যক্তির। আর অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা। এর মধ্যে সরকার কর্তৃক কৃষক ও দরিদ্র নারী পুরুষের জন্য যে ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে তার ফলেই এই পরিসংখ্যানের বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে অধিকাংশ ১০ টাকার হিসাবেই কোনো লেনদেন না হওয়ায় তা দিনে দিনে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত-অল্প শিক্ষিত মানুষ ব্যাংকের জৌলুশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ধোপ-দূরস্ত পোশাক পরিহিত ব্যাংকারদের সাথে কথা বলতে তারা এখনো অভ্যস্ত নন। সেক্ষেত্রে এমএফআইকেই তারা দরিদ্রবান্ধব মনে করে এবং নিজেদের সমস্যার কথা অকপটে জানাতে পারে। অন্যদিকে এমএফআইগুলো অতি দ্রুততার সাথে তাদের ঋণ প্রদানসহ অন্যান্য সহযাগিতা দিয়ে থাকে বিধায় তারা এসব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারে।

ফলে গ্রামের প্রায় ৩ কোটি ৩৩ লাখের অধিক দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ যারা ব্যাংকিং করার সুযোগ পায়নি তারা MFI খাতের সদস্য হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের ২২ হাজার শাখা থেকে ব্যাংকের মতোই সঞ্চয় ও ঋণ সেবা পাচ্ছে। অর্থনীতির জন্যে এটি অবশ্যই ইতিবাচক দিক। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, বর্তমানে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কিছু এমএফআই রয়েছে যাদের গ্রামীণ ব্যাংকের মতই ব্যাংকিং সেবা প্রদানের সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এমআরএ'র কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী অধিক ঋণ প্রদান করার সুযোগ তাদের নেই। এতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হলে দেশের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। কারণ, এখন এসব সংস্থার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুনিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হলে তারা অন্যান্য ব্যাংকের মতোই দরিদ্রদের উন্নয়নে কাজ করতে পারবে। সামর্থ্য রয়েছে এমন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিলে তা অর্থনীতিতে যুগান্তকারী উন্নয়ন বয়ে আনবে।

ক্ষুদ্রঋণ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সৃষ্টি

ঋণ মূলত: প্রত্যেক নাগরিকেরই মৌলিক

অধিকার। কিন্তু এ দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের জন্য এক সময় ঋণের কোনো সুযোগ ছিল না। এনজিও ও এমএফআই খাতের কল্যাণে তারা এখন ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ পাচ্ছে। তারপরও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাদের অনেকেই কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলে। বিআইডিএস এর গবেষণায় দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের ৮ শতাশ এখন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে তারা অল্প পুঁজির ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। তাদের মতে, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় উত্তরণকাল চলছে। এক সময় যারা ৫/১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তাদের একটি বড় অংশ ৫/১০ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। অনেকে ২০/২৫ লাখ টাকাও ব্যবহার করছেন। তারা

বিভিন্নমুখী ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলেছেন। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন জাতীয় অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য খাত।

ক্ষুদ্র আর্থিক সেবা

তিন দশক আগেও এনজিও/এমএফআইদের কার্যক্রম শুধু ঋণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এই কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এখন এটাকে বলা হয় ক্ষুদ্র আর্থিক সেবা যেখানে ঋণের পাশাপাশি সঞ্চয়, মানি ট্রান্সফার, জীবন বীমা ইত্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এ সেবা আরো দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে। প্রবাস থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের এক বিশাল অংশ এখন গঋও গুলো উপকার ভোগীর নিকট পৌছে দিচ্ছে। এনজিও সদস্য নারীরাও এখন মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত।

বাড়িয়ে দিচ্ছে অর্থ ও সম্মান

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ ও সঞ্চয়ের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রামাঞ্চলে যে সব পরিবারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প আছে তাদের গড় আয় অন্যদের তুলনায় বেশি। জীবনযাত্রার মানও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব রয়েছে। তাদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নেতৃত্বগুণেও মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়নে নারীর ক্ষমতায়ন

এনজিও খাত দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সেক্টরে কর্মরত রয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত কর্মী। এনজিও/এমএফআইগুলোর মাধ্যমে দেশের ৩ কোটি ৩৩ লাখ পরিবার আর্থিক সেবার মধ্যে এসেছে, যাদের মধ্যে ৯৬% মহিলা। এসব পরিবারে গড়ে ৪ জন করে সদস্য ধরা হলেও প্রায় ১৩ কোটির অধিক লোক ক্ষুদ্র অর্থায়ন নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। এক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দেশে ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

এ দেশের নারীরা একসময় ছিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন। আর্থিক ক্ষেত্রে তারা ছিল পুরুষ নির্ভর। ফলে তারা ছিল সংসারে ক্ষমতাহীন ও অবহেলিত। নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও এখন পড়াশোনা করে ভালো চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। বাড়ছে সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ। বাড়ছে নারীর ক্ষমতায়ন।

ক্ষুদ্র অর্থায়নে দেড় লাখ কোটি টাকা

এমএফআই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। তারা এখানে সঞ্চয় করে টাকা তোলে এবং প্রয়োজনে ঋণ নেয়। বর্তমানে এমএফআই সেক্টরের ক্ষুদ্র অর্থায়নের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত এখন দেড় লাখ কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থায়ন ধরলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে। এই ঋণ গুটিকয় ব্যক্তির নিকট সীমাবদ্ধ হয়নি। কোটি কোটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কাছে এই ঋণ পৌছানোর ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। অর্থনীতি পেয়েছে ভারসাম্য। এই অর্থায়নে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে, হ্রাস পেয়েছে বিশাল বেকারত্ব। উল্লেখ্য, জিডিপিতে এমএফআই খাতের অবদান প্রায় ১৪%, যা নিঃসন্দেহে আশাব্যাঞ্জক। বর্তমানে এ খাতের শাখাগুলোতে অটোমেশন কার্যকর হচ্ছে। আশার কথা, গ্রাহকদের সদিচ্ছা ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে এ খাতে ঋণ আদায়ের হার ৯৭ শতাংশ– যা আর্থিক খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয়।

মূলধনের অভ্যন্তরীণ উৎস

অনেকেরই ধারণা এনজিও মানেই বিদেশি কোনো সংস্থার অনুদান নির্ভর বা সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নয়। এই সেক্টরে বেশকটি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন হয়। এর মধ্যে সদস্যদের সঞ্চয় প্রায় ৪৩ শতাংশ, আর বাড়তি আয় বা উদ্বৃত্ত থেকে প্রায় ৩১ শতাংশ অর্থের যোগান আসে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ব্যাংক থেকে আসে ১৯ শতাংশ, পিকেএসএফ থেকে ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য উৎস থেকে আসে ২ শতাংশ। (সিডিএফ এর পরিসংখ্যান ২০১৮-১৯)

বিদেশি অর্থায়নে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। যেমন বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিসহ সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্যবিরোধী জনসচেতনতা তৈরি। বর্তমানে এ খাতে গ্রাহকদের বার্ষিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এমএফআই এর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই

প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে পুনঃবিনিয়োগ করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

যেভাবে টেকসই উন্নয়ন

পরিবার নিয়ে গ্রাম, গ্রামসমূহ নিয়েই বাংলাদেশ। প্রতিটি পরিবার যদি স্বাবলম্বী হয়, উন্নত হয়, কর্মসম্পৃক্ত থাকার সুযোগ পায় তাহলে বাংলাদেশও উন্নত দেশে পরিণত হবার সুযোগ পাবে। এদেশে এনজিও/এমএফআই সেক্টর তাদের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ দ্বারা সেই কাজটিই করছে। উন্মোচন করেছে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের স্বনির্ভর হবার সঠিক পথ।

দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। সেই ঋণ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা যেমন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে, তেমনই অনেকে আবার অন্যের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এই যে গ্রাম পর্যায়ের দরিদ্র ও হতদরিদ্ররা স্বনির্ভর হয়েছে, উন্নয়নে যুক্ত হয়েছে এর ফলেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে। অতীতে দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতো এখন তা ২৪ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্র অর্থায়নের কারণে।

ক্ষুদ্রঋণ থেকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

মাইক্রো কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র/ছোট এবং ক্রেডিট কথাটির অর্থ হচ্ছে ঋণ। অর্থাৎ মাইক্রোক্রেডিট হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ। ঋণ হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক সেবা প্রদান যা নির্দিষ্ট সময় পরে ফেরতযোগ্য। শুরুতে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষকে ১, ২, ৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করতো। পরবর্তীতে আশা, বুরো বাংলাদেশসহ অন্যরাও ক্ষুদ্র আকারের ঋণ প্রদান করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে অধিকাংশ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাই তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন ঘটিয়ে অধিক ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ফলে তাদের ঋণের চাহিদা বেড়েছে। দেশে গ্রাম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে লাখ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণী। ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক পরিসরে মাইক্রো ফাইন্যান্স (Micro Finance) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মাইক্রোফাইন্যান্স এমন একটি কর্মসূচি যা স্বল্প আয়ের মহিলা ও পুরুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়। মাইক্রোফাইন্যান্স বলতে বুঝায় স্বল্প আয়ের গ্রাহকদেরকে অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা যা শুধু আত্মকর্মসংস্থানেই নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনেও সহায়তা করে। সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থানের, বৃদ্ধি পায় জাতীয় উৎপাদন।

মাইক্রো ফাইন্যান্সের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

ক্ষুদ্র অর্থায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ১. ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিশেষ করে চলতি মূলধন সরবরাহ, ২. বিনিয়োগ গ্রহীতা ও বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন, ৩. জামানতের বিকল্প হিসেবে গ্রুপ গ্যারান্টি ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টি (অনেক এমএফআই এটি বাধ্যতামূলক করেনি), ৪. ঋণ ফেরত দেয়ার বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে সক্ষমতা অনুযায়ী বর্ধিত আকারে ঋণ প্রদান যা পারফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়, ৫. ঋণ প্রদান এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ, ৬. নিরাপদ সঞ্চয় গড়ে তোলা।

মাইক্রোফাইন্যান্স এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ১. দরিদ্র নারী ও পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংগঠিত করা, ২. তাদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা, ৩. অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ৪. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সৃষ্টি করা। এমএফআইগুলো এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ফলেই দেশের অর্থনীতি ব্যাপক গতিশীল হচ্ছে। বাংলাদেশ হয়ে উঠছে উন্নয়নের রোল মডেল।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন দিচ্ছে উন্নয়ন-সমৃদ্ধি

সত্তর দশকে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে ৫/১০টি টিনের বাড়িঘর পাওয়াও ছিল দুষ্কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছনের কুঁড়েঘরই ছিল ঠিকানা। আজ সেখানে প্রায় ৪০% বাড়িঘরই পাকা, আধা পাকা এবং বাকি বাড়িঘর টিনের। কুড়ে ঘর এখন জাদুঘরে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ঘটেছে। প্রতি গ্রামেই পাকা সড়ক, বাজার, ডেইরি, হাঁস-মুরগির খামার, সবজি চাষ, মাছের চাষ ও ক্ষুদ্র শিল্পায়ন চোখে পড়ার মতো। এসব অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রায় ৮০ ভাগই এনজিও/এমএফআইদের ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে গ্রাম পর্যায়েও । বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটারি লেট্রিনসহ উন্নত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এর মূলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন। এক সময় নিঃস্ব সর্বহারা যে মানুষেরা ছিল রাষ্ট্রের বোঝা, তারা এখন পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক শক্তিতে।

সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি ক্ষুদ্র অর্থায়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গড় আয় বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, বাল্য বিবাহ বন্ধ, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার বৃদ্ধিসহ সামাজিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। এমনকি সাম্প্রতিক কালে করোনা মহামারীতেও এমএফআই খাত স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে দেশের এই উন্নয়ন এখন শুধু সাময়িক উন্নয়ন নয়, বাংলাদেশকে এনে দিচ্ছে সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন।■

● লেখক: নির্বাহী পরিচালক
বুরো বাংলাদেশ

ক্ষুদ্রঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ একটি পর্যালোচনা

এম. মোশাররফ হোসেন

সার-সংক্ষেপ

আবহমান কাল ধরে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ 'ঋণ' শব্দটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঋণ প্রাপ্তিকে তারা তাদের নৈতিক অধিকার মনে করে। এ জন্য এটাকে নৈতিক ঋণ (Moral Credit) বলা হয়। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়। উন্নয়নের এই পর্বে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ' এবং 'চেতনা জাগ্রতকরণ' তত্ত্বসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নে অনেক উপাদান যুক্ত হয়ে বহু বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (NGO) গত চার দশকে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। নৈতিক ঋণের প্রবল চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রমাণ করেছে– 'দরিদ্ররাও ব্যাংকিং পরিষেবার উপযুক্ত।' সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই ঋণসেবা সরবরাহ করতে যেয়ে এর যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তা বিভিন্ন মহলে সব সময় আলোচিত ছিল। যদিও ঋণসেবা মূল্য নির্ধারণের সে সকল আলোচনা-সমালোচনা ততটা তথ্যনির্ভর বলে প্রতীয়মান হয়নি। আলোচ্য নিবন্ধে ঋণসেবা ব্যয়ের মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ঋণসেবা সরবরাহ করতে অর্থ খরচের প্রয়োজন হয় এবং দেখা গেছে সেই সেবা প্রাপ্তির জন্য ঋণ গ্রহীতা মূল্য দিতে আগ্রহী। সার্ভিস চার্জ (সুদ) এই সেবার মূল্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একই সেবার গুণগত মান বিবেচনায় সেবামূল্য ভিন্ন হবে। জোর করে দুইটি ভিন্নধর্মী সেবা একই মূল্যে বাঁধার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। সেবার গুণগত মান এবং প্রোডাক্ট তৈরির কলাকৌশল, উভয় বিচারেই প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সাথে ক্ষুদ্রঋণের পার্থক্য বিস্তর। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার দোরগোড়ায় ঋণের অর্থ পৌঁছে দেয় এবং সেখান থেকেই ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। ঋণ দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং সংগ্রহ করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে নানাবিধ সামাজিক/পারিবারিক উন্নয়ন কর্মকান্ড। বিস্তর এই সামাজিক/পারিবারিক উন্নয়ন

কর্মকান্ডই ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ডকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে ঋণগ্রহীতা গ্রাহকদের পাশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গরীব মানুষের সাথে থেকে মিলেমিশে উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের কেবল আর্থিক সেবাই দেয় না, বহুমুখী অ-আর্থিক সেবাও দিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি করা। কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর তার গ্রাহকদের কেবল আর্থিক সেবা দেয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের জন্য ঋণসেবা আয়কে সুদ না বলে সার্ভিস চার্জ বলা হয়। সরকারও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী আইনে ঋণসেবা মূল্যকে সার্ভিস চার্জ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প শিক্ষিত এবং সমাজ সেবায় অধিক উদ্যোগী কর্মীর প্রয়োজন। এটা অধিক শ্রমঘন শিল্প অর্থাৎ একই পরিমাণ ঋণ সরবরাহে ব্যাংকের তুলনায় অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োজিত করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেশ বিস্তৃত। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং একজন গ্রাহকের সাথে তাঁর বাড়িতে অথবা কর্মস্থলে যৌক্তিক কারণে বৎসরে প্রায় ৫০/৫২ বার যোগাযোগ করতে হয়, যেমন– ঋণী বা উদ্যোক্তা বাছাই, ঋণ ব্যবহার সরেজমিনে তদারকি, সাপ্তাহিক/মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি সংগ্রহ ইত্যাদি। গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের উদ্যোগ/কাজের বহুমুখী সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বাজার সুনাম, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সম্পৃক্ততা, পরিচালন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ গ্রাহকের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) কেবল গ্রাহকদের ঋণই প্রদান করে না– ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতা সরেজমিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণসহ নানাবিধ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। এর ফলে গ্রাহকগণ ঋণ ব্যবহারে সফলতা লাভ করে ও আয় বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মূলত গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহারের সফলতাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রধান শক্তি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঋণ ব্যবহারের সফলতার কারণে গ্রাহকদের আয়ও বহুগুণ বেশি হয়। ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের ঋণ সঠিক পন্থায় ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে সরকারের সম্প্রসারিত কর্মসূচি যথা– কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি সেবা নেয়া এবং গ্রাহকের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সহযোগিতা করে। গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সাথে সাথে পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ঋণগ্রহীতার আয় বৃদ্ধি পায়, এবং পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। মূলত এ কারণেই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গড় ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

গ্রাহকদের জন্য উপযোগী এবং তাঁদের নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি করতে সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনা করতে যেয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক ব্যয় করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে সঞ্চয় প্রোডাক্টকে Costing করলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য তা আর্থিকভাবে লাভজনক হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কেবল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভের জন্যই কাজ করে না। গ্রাহক/সদস্যদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টিকেও তারা সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দিতে গিয়ে অনেক বেশি খরচ করতে হয়। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের ঋণ তহবিলের কিছু অংশ আসে গ্রাহকের সঞ্চয় থেকে, কিছু আসে স্বল্প সুদে PKSF-এর কাছ থেকে এবং অধিক সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ থেকে। বিভিন্ন তহবিলের মিশ্রণের কারণে খরচের হেরফের রয়েছে। কাজেই একটি খরচের উপর নির্দিষ্ট মার্জিন ধরে একক কোন সুদের হার বেঁধে দেয়ার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। আকার বা পণ্যের প্রকারভেদ এবং গুণগতমান চিহ্নিত না করে কেউ যদি পণ্য প্রতি দাম বেঁধে দিতে চায় তা কার্যকর করা আদতেই বাস্তবসম্মত নয়।

সমগ্র ক্ষুদ্রঅর্থায়ন (Microfinance) কর্মকান্ডের মধ্যে যদি বিশেষ কোন প্রকল্পের অধীন ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে হয় এবং তার জন্য ভর্তুকীতে তহবিলের যোগান দেয়া হয়, সেই প্রকল্প পরিচালনা করা হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হবে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এই ধরণের প্রকল্পের অংশ যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ পোর্টফোলিও-র ৫% এর মধ্যে থাকে তবে তা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (NGO) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Not for Profit এবং লাভ কারো ব্যক্তিগত হিসাবে বন্টন হয় না। এইসব সংস্থার গভর্নিং বডি, সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকগণের Net Surplus/Profit থেকে কোন Dividend গ্রহণের কোন আইনগত বিধান নেই। প্রতি বৎসরের Net Profit সংস্থার Equity/Capital হিসাবে যুক্ত হতে থাকে এবং তা গ্রাহকদের বর্ধিত চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানে এবং MRA-এর অনুমোদন নিয়ে গ্রাহকদের সামাজিক উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য MRA সার্ভিস চার্জের (সুদ) হার সর্বোচ্চ ২৪% নির্ধারণ করে দিয়েছে– এটিও পর্যালোচনার দাবী রাখে। এখানে Profit Margin ৩.৩২% ধরা হয়েছে, যা খুবই অপ্রতুল। কারণ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষুদ্রঋণ খাতই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তখন এই Profit Margin ধরে রাখা সম্ভব হয় না বরং Profit Negative রূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের পক্ষে এই Profit Margin ৬% করার প্রস্তাব সবসময় ছিল এবং এখনও আছে।

সার্ভিস চার্জের হার নির্দিষ্ট (Cap) করে দেয়ায় আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো অতি দরিদ্রদের ঋণ প্রদানে এবং নিভৃত দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো মাইক্রোক্রেডিট থেকে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণের দিকে ধাবিত হয়েছে। একই সাথে সামাজিক কর্মকান্ড বিশেষ করে দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ সীমিত হয়ে পড়েছে, নতুন কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্থ হয়েছে, Innovation-এর দিকে সংস্থাগুলোর নজর কমেছে, গ্রাহকদের প্রাণশক্তি তাদের সঞ্চয় সংগ্রহ দুরূহ হয়েছে, নিবিড় তত্ত্বাবধায়ন কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এর ফলে খেলাপী সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে এবং সংস্থাগুলোতে কর্মরত কর্মীদের অব্যাহত যৌক্তিক চাহিদা পূরণে অক্ষমতা দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, খরাসহ যে কোন ধরণের বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও তাদের কাজ বন্ধ রাখে না। বর্ণিত সকল কারণে আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবা প্রদানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা মূল্য বেশি পড়ে এবং ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সরকার এবং মানব কল্যাণের অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন এমন সবাই একমত হয়েছেন। সামাজিক এ সেবা কাজে উচ্চ মূল্য প্রয়োজন। বিশেষ করে, সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে অনেক ব্যয় জড়িত থাকে। তাই ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ (সুদ) নির্ধারণ সাধারণ অংকের হিসাব নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে সামাজিক ব্যয়। ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি (Social Capital) গঠিত হচ্ছে– এটা আজ দৃশ্যমান। ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ নির্ধারণে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথাযথ বিবেচনার দাবী রাখে।

১. প্রারম্ভিক কথা

১.১ নৈতিক ঋণ (Moral Credit)

ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক বাজারে রাষ্ট্র কিংবা অন্যান্য বহিরাগতদের হস্তক্ষেপের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, পেছন ফিরলে উনিশ শতকের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত– সে সময় বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এ অঞ্চলে ভর্তুকি ঋণ প্রবর্তন করেছিলো। অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দাদন ব্যবসায়ীদের নিপীড়নে ক্ষুদ্র চাষী/কৃষকরা নিঃস্ব হতে থাকায় বৃটিশ সরকার উদ্বিগ্ন ছিলো, ফলে এটিকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে দাঁড় না করিয়ে ওই ঋণ কর্মসূচিকে প্রয়োগ করা হয়েছিলো দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র কৃষকদের দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। ঠিক এই কারণেই গ্রামীণ ঋণ দারিদ্র্য বিমোচন করার 'প্রবল শক্তি' ও 'নৈতিক' বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যা আজ পর্যন্ত অটুট আছে।

মূলত এ কারণেই রাষ্ট্রের কাছ থেকে 'মুক্ত' মূলধনসহ অন্যান্য আরো ভর্তুকির এক বিপুল সরবরাহ অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে থাকে এবং এর ফলস্বরূপ একটি বিদ্যমান ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অনিবার্য ভাঙ্গনের মুখে পতিত হয়; যে ব্যবস্থাটির মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো এমন যে, পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতার জন্য একে এর গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট ও তাদেরই মালিকানাধীন হতে হতো। এই ঋণ-সমবায় কার্যক্রমের সাথে অধিকাংশ সময়ই যুক্ত করা হতো গণশিক্ষা কর্মসূচিকে। আর ঋণের সাথে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম জুড়ে দেয়ার ধারণা এমন এক বৈশিষ্ট্য যা আজও রয়ে গেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই রাষ্ট্র গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন কৃষক তো দূরের কথা দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষকের দোরগোড়াতে পৌঁছাতেই চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

১.২ নতুন এক সংকর (The New Hybrid)

১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় দেশের নতুন এনজিওগুলো সেই সব তরুণ তুর্কীদের মতাদর্শের যুগপৎ সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয় যারা ১৯৭১ সালে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ এবং গ্রামীণ জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। একই সাথে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছানো ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে পরিচালনা করার নতুন নতুন ধারণাও এনজিওগুলো গ্রহণ করে এই নতুন স্বাধীন দেশের বহু বিদেশী শুভাকাঙ্ক্ষিদের কাছ থেকে। সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে পরিপূরক হিসেবে এনজিওদের বহুমাত্রিক উত্থান ও অংশগ্রহণ ছিল অপরিহার্য।

অধিকাংশ এনজিও 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ' নীতি গ্রহণ করে যেখানে পাওলো ফ্রেইরি'র 'চেতনা জাগ্রতকরণ' তত্ত্ব এবং আরো কিছু স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই বেছে নেয়া হয়। এই এনজিওগুলোর অনেকেই ঋণের মূলধন তহবিল গঠনের জন্য বিদেশী অনুদান গ্রহণ করতে থাকে। এই ঋণ তহবিল থেকে একক ব্যক্তি কিংবা যৌথ উদ্যোগ অথবা সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্র ব্যবসায় মূলধন সরবরাহ করা হতো।

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামে শুরু হওয়া গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্প ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। যুক্তি ছিলো, যদি কোন উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে দরিদ্ররা ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে তারা এটি করবে নিয়মিতভাবে ও বৃহৎ পরিসরে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রমাণ করেছে– 'দরিদ্ররাও ব্যাংকিং পরিষেবার উপযুক্ত'। গ্রামীণ ব্যাংক নৈতিকতা ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গের সাথে গ্রামীণ ঋণের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ ব্যাংকের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে, 'দাদন ব্যবসায়ীদের নিপীড়ন উৎপাটন করা' এবং পারস্পরিক সমর্থনের মাধ্যমে 'আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি' অর্জনে দরিদ্রদের সংগঠিত করা।

২. ব্যাংকিং সেবা বনাম ক্ষুদ্রঋণ সেবা

অর্থনীতির ভাষায় ঋণ প্রদান এক ধরণের সেবা, যা সরবরাহ করতে অর্থ খরচের প্রয়োজন হয় এবং সেটা পাবার জন্য ঋণ গ্রহীতা মূল্য দিতে আগ্রহী। অর্থাৎ সুদ একটি বিশেষ সেবার মূল্য। কোন কিছুর মূল্য নিয়ে কথা উঠলেই এর যৌক্তিক কারণগুলো সকল মহলে আলোচিত হয়– এটাই স্বাভাবিক। ক্রেতা বা গ্রহীতারা ঐ সেবার অপরাপর সমধর্মী সেবার মূল্য নিয়ে আলোচনা করবে তাও স্বাভাবিক। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, গুণগত মান বিবেচনায় একইধর্মী সেবার মূল্য ভিন্ন হতে পারে। জোর করে দুইটি ভিন্নধর্মী সেবা একই মূল্যে বাঁধার কোন যৌক্তিক কারণ নেই এবং সেটা কোথাও সম্ভব হয়নি।

সেবার গুণগত মান এবং সেবা তৈরির কলাকৌশল, উভয় বিচারেই প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সাথে ক্ষুদ্রঋণের পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজের অফিসে বসে সঞ্চয় জমা সংগ্রহ করে, এবং মূলত সেখানে বসেই বড় অংকের ঋণ অনুমোদন করে। সঞ্চয় জমা বৃদ্ধির জন্য প্রচার মাধ্যম ব্যবহার অথবা মাঝে-মধ্যে বিশেষ গ্রাহককে আপ্যায়ন করা হয়। মাঝে মাঝে ঋণ আবেদনকারীর অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কিছু সাইট ভিজিট করা হয়।

এসবের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার দোরগোড়ায় ঋণের অর্থ পৌঁছে দেয়। প্রাথমিক দল গঠন, ঋণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সপ্তাহ-ভিত্তিক ঋণ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গ্রহীতা পরিবারের নানাবিধ সামাজিক তথ্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে গ্রাহকদের পাশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় পদক্ষেপ

নেয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখতে হয় বিধায় তখন কোন আয় হয় না, অধিকন্তু ব্যয় যথারীতি চলতে থাকে।

৩. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) মূলত Societies Registration Act, ১৮৬০ এবং Social Welfare Act, ১৯৬১ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এবং MRA থেকে সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এইসব সংস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে NOT FOR PROFIT এবং লাভ কারো ব্যক্তিগত হিসাবে বন্টন হয় না। এইসব সংস্থার গভর্নিং বডি, সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকগণের Net Surplus/Profit থেকে Dividend গ্রহণের কোন আইনগত বিধান নেই। প্রতি বৎসরের Net Profit সংস্থার Equity/Capital হিসাবে যুক্ত হতে থাকে এবং তা গ্রাহকদের বর্ধিত চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানের এবং MRA-এর অনুমোদন নিয়ে গ্রাহকদের সামাজিক উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সেবার পরিধি

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের কেবল আর্থিক সেবাই (Financial Services) দেয় না বরং বিভিন্ন ধরণের (নিচের স্তবকে উল্লেখিত) অ-আর্থিক সেবাও (Non-Financial Services) দিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো, গ্রাহকদের পরিবারের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো এবং স্যোশ্যাল ক্যাপিটাল সৃষ্টি করা। কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর এর গ্রাহকদের কেবলমাত্র আর্থিক সেবাই দিয়ে থাকে। অ-আর্থিক সেবা দেয়া এদের উদ্দেশ্য নয় এবং এদের গঠন প্রণালী বা কাঠামো সেভাবে গঠিতও হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কাজের এই ভিন্নতার কারণে গ্রাহকদের যে ঋণ সেবা প্রদান করে, সেই সেবা থেকে অর্জিত আয়কে সুদ-আয় (Interest Income) না বলে সেবা-মূল্য (Service Charge) বলা হয়। সরকারও এই বিষয়টির মর্মকথা উপলব্ধি করে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী আইন, ২০০৬ এ ঋণের সেবা থেকে অর্জিত আয়কে সুদ-আয় (Interest Income) না বলে সেবা-মূল্য (Service Charge) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অ-আর্থিক সেবার আওতায় ঋণ গ্রহীতার জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রচলিত সাধারণ আইন, জেন্ডার ইস্যু, শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচির উপর নিয়মিত মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সকল সামাজিক সেবা বাণিজ্যিক ব্যাংক করতে পারে না, কারণ তাদের সাংগঠনিক কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয়নি।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI) সমূহ কাজ করে সমাজের প্রান্তজনদের সাথে। এটিই তাদের কর্মক্ষেত্র আর উদ্দেশ্য হলো, প্রান্তিক জনগণকে সচেতন করে তুলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের গরীব মানুষের সাথে (Work with the poor) থেকে কাজ করে। অর্থাৎ সার্বক্ষণিক গরীব মানুষের সাথে থেকে নিবিড় ও গভীর আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে প্রিয়জন/আপনজন হিসেবে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এই জটিল কাজে সময়, শ্রম, মেধা, ব্যয় বেশি প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রান্তজনকে ব্যবসায়িক লক্ষ্যবস্তু ধরে কাজ করে না, বরং কাজ করে তাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা উন্নয়ন করার জন্য।

৫. শ্রমঘন শিল্প

অর্থনীতির পরিভাষায়, প্রথাগত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় তুলনামূলকভাবে স্বল্পশিক্ষিত এবং সমাজ সেবায় অধিক উদ্যোগী কর্মীর প্রয়োজন; এটা অধিক শ্রমঘন শিল্প অর্থাৎ একই পরিমাণ ঋণ সরবরাহে অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেশি বিস্তৃত। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং একজন গ্রাহকের সাথে তাঁর বাড়িতে/কর্মস্থলে যৌক্তিক কারণে বৎসরে প্রায় ৫০/৫২ বার যোগাযোগ করতে হয়; যেমন - ঋণী বাছাই, ঋণের চাহিদা বিশ্লেষণ, ঋণ ব্যবহার তদারকী, সাপ্তাহিক/মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায় ইত্যাদি। এসব কারণেই ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার ব্যয় বেশি।

গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের পূর্বে প্রস্তাবিত উদ্যোগ/কাজের (ব্যবসা) বহুমুখী সম্ভাব্যতা যাচাই করা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটি বড় কাজ। দেখা হয় উদ্যোক্তা (Entrepreneur) হিসেবে ঋণ গ্রহীতার সকল গুণাবলী যথা– সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বাজার সুনাম, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সম্পৃক্ততা, পরিচালন ক্ষমতা ইত্যাদি অনুকূলে আছে কী না। ব্যবসাটি যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে টেকসই এবং কারিগরি দিক থেকে সম্ভাবনাময় থাকে তাহলে গ্রাহককে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে ঋণ মঞ্জুরের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব বিবেচনায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ডে অনেক বেশি কর্মীর প্রয়োজন হয় এবং অধিক ব্যয়ও জড়িত থাকে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায়/কাঠামোতে একজন Loan Officer বা Relationship Manager গড়ে ৫ কোটি টাকা থেকে ৮০ কোটি বা তদূর্ধ্ব টাকার ঋণাংক দেখভাল করে। অপরদিকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে একজন Loan Officer বা Program Organizer ৫ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকার ঋণাংক এবং এর সাথে জড়িত ২০০ থেকে ৩০০ সদস্য/গ্রাহককে দেখভাল করে। শুধু ঋণই নয়, সেই গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হয় সার্বিক নিরাপত্তার সাথে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথেও সম্পৃক্ত থাকতে হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ একজন Loan Officer যেখানে ৮০ কোটি টাকার ঋণ তদারকী করে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে এই ৮০ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থাপনা করতে কমপক্ষে ২৫-৩০ জন Loan Officer এবং ৮টি শাখার প্রয়োজন হয়। ৮টি শাখার জন্য ৮ জন ব্যবস্থাপক ও ৮ জন হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন হয়। এর সাথে জড়িত হয়ে পড়ে ৮টি শাখার সকল খরচ, যেমন– অফিস ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, কর্মীদের যাতায়াত বিল, বেতন ও ভাতা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে Loan Officer কেই তার আওতাধীন গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি এবং গ্রাহকদের প্রদত্ত সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য পূর্ণ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এজন্য একজন Loan Officer এর সাধারণ নিয়মে বৎসরে ৫০/৫২ বার গ্রাহকদের নিকট যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তাকে এর বহুগুণ বেশি যাতায়াত করতে হয়। ঋণের কিস্তি সংগ্রহের জন্য নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা বা গ্রাহকদের নিকট সরেজমিনে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ জন্যই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমঘন শিল্প। শ্রমঘন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বেশি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৬. ঋণ সেবার বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান সেবা হলো– 'ঋণ সেবা'। এই সেবার মর্মবাণী বিশ্লেষণে এটা অনুধাবন করতে হবে যে– এই সেবা গ্রহণ করে গ্রাহকগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং এই সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের যৌক্তিকতাই বা কী।

৬.১ প্রাক কথন

আবহমান কাল ধরেই এ অঞ্চলে 'ঋণ' শব্দটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্বে ঋণের উৎস ছিল মহাজন, ভূ-স্বামী, ফড়িয়া প্রমুখ শ্রেণী। অর্থের প্রয়োজন হলেই মানুষ উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কাছে জমি বা মূল্যবান সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হতো, কারণ ঋণের টাকা

ফেরত না দিতে পারায় তারা তাদের সম্পদ বা সম্পত্তি হারাতো।
দিন পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা ধরণের বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এসব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান জনগণকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারেনি। বিশাল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঋণের চাহিদা মেটাতে স্বাধীনতা উত্তরকালে আবির্ভূত হয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, এই প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন রকম ঝুট ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে প্রান্তিক জনগণকে ঋণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত করেছে। উন্নয়নের মূল সমস্যাই হচ্ছে বেকার সমস্যা এবং স্বল্প আয়, যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য সমস্যা এবং এই সমস্যাগুলো দুষ্টচক্রের মত আবর্তিত হচ্ছে। এই দুষ্টচক্রকে ছিন্ন করার অন্যতম উপায় হচ্ছে শর্তহীন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম। কেননা ঋণ সম্পদ হিসাবে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সহায় সম্পদ ও ভূমিহীন মানুষকে কাজে নিয়োজিত করে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এভাবে ঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনে বিশাল অবদান রাখছে।
এই সকল দরিদ্র, ভূমিহীন ও অনুৎপাদনশীল বেকার জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে দরকার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রেরণা, যার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান জনগোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম/পেশার দিকে অবশ্যই ধাবিত করতে হবে। এই জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম বা উৎপাদনশীল করে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই কিছু মূলধনের প্রয়োজন পড়ে।

৬.২ ঋণ কর্মসূচির প্রধান দর্শন

দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান দিকগুলো হলো:
(১) ঋণ প্রাপ্তি মানুষের অধিকার।
(২) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ঋণ ব্যবহারে যোগ্য ও দক্ষ।
(৩) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পারিবারিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা।

৬.৩ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে:
(১) লাভজনক, আয়মূলক, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। একইসাথে ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঐ সমস্ত প্রকল্প/কাজকে স্থায়ী করতে সাহায্য করা।
(২) দরিদ্র মানুষদের দীর্ঘদিনের ঋণগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত করা, তাঁদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানো।
(৩) ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সংগঠিত দরিদ্র জনগণকে দলীয় কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা ও সমাজের অব্যবহৃত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
(৪) কর্ম উদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মজুরি/নায্য মজুরি নিশ্চিত করা।
(৫) প্রচলিত জামানত বা বন্ধকী ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বিপরীতে বন্ধকহীন বা জামানতহীন ঋণ কর্মসূচিকে চালু করা ও দরিদ্র জনগণের ঋণ ব্যবহার ক্ষমতাকে প্রমাণ করা।
(৬) মহিলাদের আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
(৭) উন্নয়নে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
(৮) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসাবে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা।
(৯) ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
(১০) কর্ম/চাকুরীর সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসার চাপ/প্রবণতা রোধ করা।
(১১) সুসংগঠিত ও শৃংখলিত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
(১২) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে (ক) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং (খ) খাদ্য আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

৬.৪ ঋণী বাছাই ও ঋণ বিতরণ

পেশাদারি ব্যাংকিং-এর সাথে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এর কর্মীগণ সামাজিক সেবা প্রদানকারী পেশাদার হিসেবে কাজ করে। তারা যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রাহকের কাঁধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে টার্গেট পূরণ করে না। তারা গ্রাহকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। ঋণ দেয়ার সময় মনে করে এই টাকার মালিক বা পার্টনার সে এবং গ্রাহকরাও। গ্রাহকদের ঋণ দেয়ার পূর্বে যে কাজ-কারবারের জন্য গ্রাহক ঋণ গ্রহণ করবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সে কাজে নিজেদেরও অংশীদার মনে করে। নিজের ব্যবসা মনে করে নিজেকে সেই ব্যবসার মালিক বা পার্টনার মনে করে ঋণগ্রহীতা গ্রাহককে আন্তরিকভাবে সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও ভাল ব্যবসার কাজে উদ্যোক্তা গ্রাহককে সময়মত পর্যাপ্ত ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করে। উদ্যোক্তা গ্রাহকের এবং তার কারবার এবং লেনদেনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাতে ঋণের টাকা অন্যত্র না সরিয়ে ঠিকমত নির্ধারিত ব্যবসার কাজে ব্যবহার করে এবং এই ব্যবসার আয় থেকে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে পারে।
ঋণ ব্যবস্থাপনা সঠিক পন্থায় চালানোর জন্য গ্রাহকদের ঋণ দেয়ার পূর্বেই প্রাথমিক পর্যায়েই ভালভাবে যাচাই-বাছাইয়ের কৌশল হিসেবে ঋণ প্রস্তাবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- উদ্যোক্তা (Entrepreneur) এবং উদ্যোগ/কাজ (Enterprise)।
উদ্যোক্তা গ্রাহক-এর নিকট থেকে পাওয়া ঋণ প্রস্তাবকে যাচাই-বাছাইকরণের জন্য সততা (Honesty), ন্যায়পরায়ণতা (Integrity), আন্তরিকতা (Sincerity), সম্পৃক্ততা (Involvement), বাজার সুনাম (Goodwill/Market Reputation), শুরু করার আগ্রহ (Initiative), প্রেরণা (Drive), লক্ষ্য (Target) ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কেবল তাই নয়, গ্রাহককে এভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে নেয়া হয়। এজন্য সময়ের প্রয়োজন হয় এবং এর সাথে খরচও বেড়ে যায়।
উদ্যোগ/কাজ (Enterprise) সম্পর্কিত পর্বে জোর দিয়ে ঋণ ব্যবহারের সফলতার জন্য উদ্যোক্তার সাথে সাথে উদ্যোগকেও পরিপূরক হিসেবে সমভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। এভাবে ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও স্থির করা হয়। উদ্যোগ বা ঋণের টাকায় যে ব্যবসা করা হবে তার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কাজে তা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হিসেবে তার সম্ভাব্যতার উপর যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সঠিকভাবে করা না হলে ঋণ ব্যবহার সফল হবে না। সে জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ এই সকল কাজে গভীর মনোনিবেশ করে। ঋণ প্রস্তাবের Cost Benefit Analysis-এর ফলাফল Cost Effective বা Self Generating না হলে সেই প্রস্তাবের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু এই কাজগুলো করার জন্য গ্রাহকদের উদ্যোগ/কাজ (Enterprise)-কে গ্রাহকদের সাথে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়া হয় এবং এর জন্য সময় ও ব্যয় জড়িত থাকে।
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের ঋণ প্রদানে কোন আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার বেড়াজালে বন্দী না করে গ্রাহকদের প্রয়োজনের সময় ঋণ প্রদান করে থাকে। গ্রাহক যে দিন ঋণের জন্য আবেদন করবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারপরের দিন অথবা গ্রাহকের চাহিদাকৃত তারিখে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রাহকদের এজন্য কোন কাগজ-পত্র/দলিলাদি প্রদান করতে হয় না। গ্রাহক ঋণ গ্রহণের সময় প্রতিষ্ঠানের একটি ফরমে স্বাক্ষর করে ঋণের টাকা এবং পাশবই নিয়ে যায়। গ্রাহকের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬.৫ ঋণ ব্যবহারের সফলতা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) কেবল গ্রাহকদের ঋণই প্রদান করে না– ঋণ ব্যবহার সরেজমিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণসহ নানাবিধ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। এর ফলে গ্রাহকগণ ঋণ ব্যবহারে সফলতা লাভ করে এবং আয় বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মূলত গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহারের সফলতাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রধান শক্তি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঋণ ব্যবহারের সফলতার কারণে গ্রাহকদের আয়ও বহুগুণ বেশি হয়। ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের ঋণ সঠিক পন্থায় ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে সরকারের সম্প্রসারিত কর্মসূচি যথা– কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। গ্রাহকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সহযোগিতা করে। গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সাথে সাথে পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ঋণগ্রহীতার আয় বৃদ্ধি এবং পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা নিয়মিত কিস্তি প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গড় ঋণ আদায়ের হার ৯৭% অতিক্রম করে যায়।

এ কথা অনস্বীকার্য, ক্ষুদ্র অংকের ঋণ ব্যবহারে গ্রাহক পর্যায়ে আয়ও (Return) বেশি হয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত রয়েছে ঋণ ব্যবহারে গ্রাহক পর্যায়ে নিবিড় পরিচর্যা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছে এবং প্রতিদিন ঐ টাকার মাছ ক্রয় করে তা বিক্রি করে থাকে। প্রতিদিন ঐ গ্রাহকের যদি কমপক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) টাকাও আয় হয় এবং মাসে ২০ দিন কাজ করে তবে বৎসরে আয় হবে ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা। অধিকন্তু ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা তার পুঁজিও থেকে যাবে। ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ঋণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে বছরে সুদ প্রদান করতে হয় ১,৯২০ (এক হাজার নয়শত বিশ) টাকা। এই চিত্র দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ক্ষুদ্রঋণের আয় (Return) বেশি, ফলে সহজেই গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারে।

৬.৬ প্রণোদনা প্রদান

এ সকল কাজ করতে প্রয়োজন সৎ কর্ম প্রেরণা বা মোটিভেশন। মোটিভেশন প্রক্রিয়ায় রয়েছে দুই ভাগ– (ক) প্রথমেই মানতে হবে অধিকাংশ মানুষ ভাল এবং সুযোগ পেলে তারা আরো ভাল করতে পারে। (খ) অধিকাংশ মানুষই জানেন ভাল করতে কি প্রয়োজন। তাই কর্মীবাহিনীর মোটিভেশন ধরে রাখার সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সততা, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ কাজ করে বলে সফলতা এসেছে। কখনও কখনও অপ্রতিরোধ্য এবং নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত দৈব কারণে গ্রাহকদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হলে নেয়া হয় প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজ হলো– (ক) সমাজের ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের জন্য দেশের সর্বত্র উপযোগী কাজ সৃষ্টি করা। (খ) উক্ত কাজের জন্য সুযোগ্য উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং (গ) তাদের সেই কাজে এগিয়ে যেতে সৎ এবং গঠনমূলক পরামর্শসহ সময়মত পরিমিত ঋণ বা অর্থের যোগান দিয়ে সহযোগিতা করা। এ কাজগুলো যথার্থভাবেই করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মূল পুঁজি হচ্ছে গ্রাহকদের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং গ্রাহকদের মূল পুঁজি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন। ফলে প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক উভয়ই লাভবান হয়।

গ্রাহকদের ঋণ চাহিদা এমনভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে নিরূপণ করা হয় যাতে Over financing বা Under financing না হয়। Over financing বিপদজনক এবং Under financing গ্রাহককে বঞ্চিত করে।

বর্ণিত কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সেবার মূল্য বেশি পড়ে যা সরকার এবং অর্থনীতি নিয়ে যারা কাজ করেন সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার খরচ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

৭. সঞ্চয় সেবার বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রধান সেবা– 'সঞ্চয় সেবা'। এই সেবা গ্রহণ করে গ্রাহকগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং সেবা প্রদান করে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যয়ের যৌক্তিকতাই বা কী– সে বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১ ক্ষুদ্র সঞ্চয়– গ্রাহকদের প্রাণশক্তি

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সঞ্চয়কে ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে তহবিলের বড় উৎস ও শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অতীতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেনের দৃষ্টি ছিল ঋণের উপর। দুর্ভাগ্যক্রমে অর্থ লেনদেন প্রবাহে সঞ্চয় "অর্ধেক" ভূমিকা রাখে তা অস্বীকার করা হয়েছিল। ধারণা করা হতো ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেনকারী গ্রাহকদের সঞ্চয় করার ক্ষমতা এবং চাহিদাও কম। এখন এটা প্রায় স্বীকৃত যে, পরিবারগুলো তাদের বাড়তি টাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে

জমা রাখে যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে গঠিত হয় এবং গ্রাহকদেরকে এমন ধরণের সঞ্চয় কর্মসূচি দেয়, যা তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেন কার্যক্রমের আলোচনায় সঞ্চয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে উঠে এসেছে। ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের চেয়ে সঞ্চয়কে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতো এবং গ্রাহকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় আদায় করা হতো কারণ তাদের একটি প্রচলিত এবং বদ্ধমূল ধারণা ছিল– "দরিদ্ররা সঞ্চয় করতে পারে না"। ফলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পদ্ধতি করা হয়েছিল ঋণ গ্রহণের শর্ত হিসেবে।

৭.২ গ্রাহকদের সঞ্চয় করার অভাবনীয় ক্ষমতা

দরিদ্রদের মধ্যে অবাধে সঞ্চয় জমা ও উত্তোলনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও ক্ষমতা রয়েছে। এই আগ্রহ যখন নমনীয় এবং আকাঙ্ক্ষিত সঞ্চয় সুবিধার সাথে যুক্ত হয়, তখন বড় মাপের সঞ্চয় গড়ে তোলে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বিগত বৎসরসমূহের অভিজ্ঞতা বলে যে, স্বেচ্ছা ও উন্মুক্ত সঞ্চয় প্রকল্পগুলো প্রতি বৎসর বাধ্যতামূলক, উত্তোলন অযোগ্য সঞ্চয় প্রকল্পের চাইতে অনেক বেশি গ্রাহকপ্রতি নিট সঞ্চয় জমা করতে পারে। এইভাবে দরিদ্রদের সঞ্চয় ক্ষুদ্র অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃহত্তর পুঁজি তৈরী করতে পারে এবং গ্রাহকদের জন্যে একটি সুব্যবহৃত ও উপকারী সুবিধা প্রদানে সমর্থ হয়।

কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত সঞ্চয়ে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র মানবিক অধিকারই নয়, এটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করে।

সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আয়বর্ধক প্রকল্প, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সন্তানের শিক্ষা ব্যয়, গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করার জন্যে ছোট ছোট পুঁজি গঠন করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদেরকে উন্মুক্ত সঞ্চয় সুবিধার মাধ্যমে মূল্যবান সেবা প্রদান করে।

৭.৩ গ্রাহকদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, সদস্যরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হবে এবং সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার করে মূলধন তহবিল গড়ে তুলবে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একটি প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সঞ্চয় নীতিমালা অনুসরণ করে:

(১) সামগ্রিক অর্থ লেনদেন প্রবাহে সঞ্চয় "অর্ধেক" ভূমিকা রাখে। সে জন্য সমগ্র Microfinance কার্যক্রমে "সঞ্চয়"-কে সদস্যদের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

(২) "সঞ্চয়" সদস্যদের পরনির্ভরশীলতা থেকে অর্থাৎ সংস্থার ঋণ থেকে অনেকাংশে মুক্ত থেকে তাদের নিজস্ব "পুঁজি" সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সদস্যরা "সঞ্চয়"-এর মাধ্যমে যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে এবং নিজস্ব মূলধন গড়ে তুলতে পারে তা সর্বদাই উৎসাহিত করা।

(৩) বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দরিদ্র সদস্যদের সঞ্চয় করার এক অভাবনীয় ক্ষমতা রয়েছে। সংস্থা দরিদ্রদের এই অভাবনীয় শক্তিকে সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালনা করবে।

(৪) গ্রাহকদের সঞ্চয়কে সৃজনশীলতার সাথে ব্যবহার ও তাদের উপকারার্থে সংস্থা দরিদ্রদের সঞ্চয় করাকে কোন বাধ্যতামূলক বেড়াজালে বন্দী করে না। সদস্যদের "সঞ্চয় জমা" করাকে তাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অনুরূপভাবে "সঞ্চয় উত্তোলন"-কে করা হবে তাদের মত করে অর্থাৎ তারা যখন ফেরত নিতে ইচ্ছুক হবে তখনই ফেরত নিতে পারবে। এক কথায় সদস্যর জমাকৃত সঞ্চয় "চাহিবা মাত্র ফেরতযোগ্য"। এমনকি কোন সদস্যর ঋণ অবশিষ্ট থাকলেও উক্ত সদস্য প্রয়োজনে তার সকল সঞ্চয় ফেরত নিতে পারবে। সদস্যদের তাৎক্ষণিক যে কোন বিপদ মোকাবেলার সুবিধার্থে সঞ্চয় উত্তোলনকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা।

(৫) সদস্যরা যাতে নিয়মিত/অনিয়মিত, উপার্জিত/কষ্টার্জিত অর্থ নিরাপদে এবং খুব সহজে ব্যবহারযোগ্য করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(৬) দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করা। এ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে "ঋণ" এবং "সঞ্চয়"-কে সমানভাবে দেখা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা।

(৭) "সঞ্চয়"-কে "ঋণের" জামানত হিসেবে সংরক্ষণ না করা।

৭.৪ ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে অধিক ব্যয়

গ্রাহকদের জন্য উপযোগী এবং তাঁদের নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি করতে বর্ণিত সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনা করতে যেয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক ব্যয় করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে সঞ্চয় প্রোডাক্ট-কে কস্টিং করলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য তা আর্থিকভাবে লাভজনক হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কেবল আর্থিক লাভের জন্যই কাজ করে না। গ্রাহক/সদস্যদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়ে সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ-এর একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী MicroSave ঐ প্রতিষ্ঠানের Product Costing করেছে এবং সেখানে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির নিট লাভ হয়েছে ১.৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঋণ সেবা থেকে আয় হয়েছে ২.৩৮ কোটি টাকা (১৭৭.৬১%) এবং সঞ্চয় সেবা থেকে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়েছে (১.০৪) কোটি টাকা (৭৭.৬১%)। গ্রাহকদের নিকট থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করার Collection Management এবং তার রেকর্ডভুক্তকরণ, হিসাব সংরক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি কাজসমূহ করতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ঋণসেবা থেকেও অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। এজন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সার্বিক ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি।

ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গ্রহণ করতে পারে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী। অপর দিকে Bank/NBFI দেশের সকল সাধারণ মানুষ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই সুযোগ দেয়া হলে সঞ্চয় সংগ্রহের Costing কিছু কমে আসত। বিদ্যমান আইনে দেখা যায় একটি ব্যাংক ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করে অবাধে সীমাহীনভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারে। আবার NBFI সমূহ ১০০ (একশত) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে ব্যাংকের মত একই কাজ করতে পারছে। অপর দিকে অনেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মূলধন/নিজস্ব তহবিল ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা এবং ১০০ (একশত) কোটি টাকার অনেক বেশি রয়েছে। কিন্তু সেই সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারছে না। আইনের এই বৈষম্য তুলে দেয়া গেলে ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকরা উপকৃত হতো। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে ক্ষুদ্রঋণের তহবিল যোগান দেয়া যেতে পারে। এটা করা হলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় সাশ্রয় হতো।

CDF-এর তথ্য ভান্ডারে (৩০ জুন ২০১৯) দেখা যায় ২২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পুঁজির (Capital) পরিমাণ ১০০ (একশত) কোটি টাকার বেশি। আবার ২২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠানের পুঁজির (Capital) পরিমাণ ৪০০ (চারশত) কোটি টাকার বেশি। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

৮. MRA কর্তৃক সার্ভিস চার্জ বা সুদ নির্ধারণ

লাইসেন্সপ্রাপ্ত (৭৫৯টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান) সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় পর্যালোচনা করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা MRA ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার ২৪% নির্ধারণ করেছে নিম্নোক্তভাবে-

আর্থিক ব্যয়	৬.১০%
প্রশাসনিক ব্যয়	১৩.১৩%
ঋণক্ষয় সঞ্চিতি	১.৪৫%
Profit Margin	৩.৩২%
মোট	২৪%

যদিও Profit Margin ৩.৩২% ধরা হয়েছে, কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল। কারণ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষুদ্রঋণ খাতই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তখন এই Profit Margin ধরে রাখা সম্ভব হয় না বরং Profit Negative রূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের পক্ষে এই Profit Margin ৬% করার প্রস্তাব সবসময় ছিল এবং এখনও আছে।

২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেন, সরকার ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার ২৪% করে দিয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার ২৪% নির্ধারণ করে MRA ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ এ বিষয়ে সার্কুলার ইস্যু

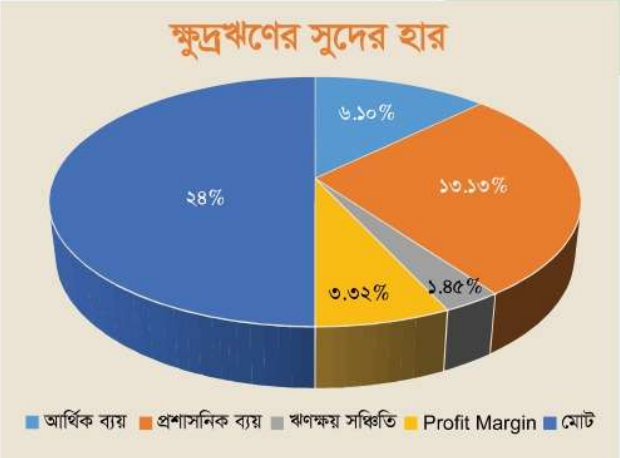

করে। (সূত্র– বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্য বিবরণী, ২২ জানুয়ারি ২০২০)

৯. সার্ভিস চার্জ বা সুদ ধার্য– পরিমাপকরণ/যৌক্তিককরণ

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দিতে গিয়ে অনেক বেশি খরচ করতে হয়। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের ঋণ তহবিলের কিছু অংশ আসে গ্রাহকদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে, কিছু অংশ আসে PKSF-এর ঋণ থেকে এবং বাকি অংশ আসে অধিক সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ থেকে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মোট তহবিলের ২৩% আসে অধিক সুদে ব্যাংক ঋণ থেকে (CDF তথ্য)। গ্রাহকদের নিকট থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে ৬%-১০% বাৎসরিক সুদ প্রদান করতে হয়। PKSF থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয় বাৎসরিক ৫% থেকে ৭.৫০% সুদে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয় ৯% থেকে ১২% বাৎসরিক সুদে। অর্থাৎ বিভিন্ন তহবিলের মিশ্রণের কারণে খরচের হেরফের রয়েছে। কাজেই একটি তহবিল বা খরচের উপর নির্দিষ্ট মার্জিন ধরে একক কোন সুদের হার বেঁধে দেয়ার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। আকার বা পণ্যের প্রকারভেদ এবং গুণগতমান চিহ্নিত না করে কেউ যদি পণ্য প্রতি দাম বেঁধে দিতে চায়, তা কার্যকর করা আদতেই বাস্তবসম্মত নয়।

প্রচলিত ব্যাংকিং সেক্টরে পুঁজির খরচের সাথে মার্জিনযুক্ত করে সুদের হার নির্ধারণ করার যে প্রক্রিয়া রয়েছে তা ক্ষুদ্রঋণ খাতে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। প্রায়শই বলা হয়, কম সুদে ক্ষুদ্রঋণ খাতে পুঁজি সরবরাহ করলে এই খাত সুদের হার কমাতে পারবে। কিন্তু এটা বাস্তব সম্মত নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কোন ব্যাংক কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে ৫% সুদে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে শর্ত দিলে উক্ত ঋণের টাকা ১০% সুদে গ্রাহকদের দিতে হবে। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না। কেননা, ঐ প্রতিষ্ঠানের ঋণ পোর্টফোলিও (মাঠে অবশিষ্ট ঋণ) রয়েছে হয়তো ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা। কেবলমাত্র ঐ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা কম সুদে ঋণ তহবিল প্রাপ্তির কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান তার ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার ঋণ পোর্টফোলিও হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে না। ঐ ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুঁজির সংস্থান হয়েছে উপরে বর্ণিত তিনটি খাত (ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের সঞ্চয়, PKSF থেকে ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ) থেকে। যেখানে ঋণ তহবিল যোগান ব্যয়ের ভিন্নতা রয়েছে।

তবে সমগ্র ক্ষুদ্রঅর্থায়ন (Microfinance) কর্মকান্ডের মধ্যে যদি বিশেষ কোন প্রকল্পের অধীন ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে হয় এবং তার জন্য ভর্তুকীতে তহবিলের যোগান হয়, সেই প্রকল্প পরিচালনা করা হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হবে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই ধরণের প্রকল্পের অংশ যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ পোর্টফোলিও-র ৫% এর মধ্যে থাকে তবেই তা ভর্তুকীকৃত তহবিল ব্যয়ের অংশ নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ (সুদ) থেকে ঐ পরিমাণ কমিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ– বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত SMAP প্রকল্প, যা ১৯% সুদে প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে। এছাড়া, কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রণোদনা প্যাকেজের ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা, যা গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে ৯% সুদে।

১০. নিয়ন্ত্রণ বা আইনি কাঠামোর পূর্বে সার্ভিস চার্জ বা সুদ ধার্য

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) গঠন হওয়ার পর ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখে MRA ক্ষুদ্রঋণ সার্ভিস চার্জের (সুদ) হার নির্ধারণ করে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২৭%। এর পূর্বে ৩৫ বৎসর ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য কোন Regulation বা আইনী কাঠামো না থাকলেও সকল প্রতিষ্ঠানসমুহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে ১৫% সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতো। যা কার্যত ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে দাঁড়ায় ২৭% এর সামান্য কম/বেশি। MRA সার্ভিস চার্জ আদায়ের পদ্ধতি ফ্ল্যাট থেকে ক্রমহ্রাসমান ঠিক করে ২৭% নির্ধারণ করে দেয়।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমুহ Regulation/আইনিকাঠামোর পূর্ব থেকেই গ্রহণযোগ্য সার্ভিস চার্জ বাস্তবায়ন করেছে। এর জন্য ক্ষুদ্রঋণ খাতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

১১. সার্ভিস চার্জ (সুদ) উপযোগী না করার প্রভাব

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO-MFI) সমূহের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার বা সার্ভিস চার্জের হার উপযোগী না করাতে নিম্নরূপ প্রভাব পড়ছে এবং পড়বে:

১১.১ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা বঞ্চিত হচ্ছে

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অতি দরিদ্রদের ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহিত হয়েছে। কারণ সুদ হার/সার্ভিস চার্জ হার নির্দিষ্ট (Cap) করে দেয়াতে আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ছোট ঋণ প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎসাহ কমেছে এবং তারা বড় ঋণ প্রদানের দিকে মনোযোগী হয়েছে। Credit and Development Forum-এর প্রকাশিত Microfinance Statistic তথ্য ভান্ডার থেকে দেখা যায় ডিসেম্বর, ২০১২ সালে NGO-MFI-দের মোট ঋণের ৭২% ছিল Microcredit এবং ২৮% ছিল Microenterprise Credit. সাড়ে ছয় বৎসর পর জুন ২০১৯ এ দেখা যায় মোট ঋণের ৫৯% দাঁড়িয়েছে Microcredit অর্থাৎ ১৩% কমেছে এবং Microenterprise Credit-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১% অর্থাৎ ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, Microcredit-এর অংশটি দখল করেছে Microenterprise।

১১.২ খেলাপী সংস্কৃতি গড়ে উঠবে

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাহকদের ঋণ গ্রহণ থেকে ব্যবহার এবং পরিশোধ পর্যন্ত নিবিড় তত্ত্বাবধান করে থাকে এবং এর জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যয় করতে হয়। সার্ভিস চার্জের (সুদ) হার নির্দিষ্ট করার ফলে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ঋণ খেলাপী সংস্কৃতি গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

সার্ভিস চার্জের হার হ্রাস করলে ক্ষুদ্রঋণ খাতে খেলাপী বৃদ্ধি পাবে। কারণ, ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ণভাবে একটি নিবিড় তদারকী নির্ভর ঋণ কার্যক্রম। নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার ফলেই ক্ষুদ্রঋণের আদায় হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিটি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণের আদায় হারের এই সফলতা মূলত কর্মী এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তদারকীর উপরই নির্ভরশীল। সার্ভিস চার্জের হার কমালে সংস্থার আয় কমে যাবে। এতে সংস্থাগুলো পরিবীক্ষণ ও

তদারকীর কাজে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা হ্রাস করতে বাধ্য হবে। ফলে, নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার অভাবে ক্ষুদ্রঋণের খেলাপী বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রসারে ব্যাঘাত ঘটবে।

১১.৩ নিভৃত পল্লী এলাকায় কার্যক্রম সীমিত হবে

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো সার্ভিস চার্জের হার হ্রাস বা আয় হ্রাসজনিত খরচ সংকোচন ও ঋণের ঝুঁকি বিবেচনায় এনে নিভৃত দূরবর্তী পল্লী এলাকার (Remote Area) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সামর্থ্য হারানো ও নিরুৎসাহিত হবে। ফলে সংস্থাগুলোর শহর ও নগর অঞ্চলে সুবিধাজনক স্থানে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জনগণের মাঝে কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রবণতা বাড়বে। নিভৃত পল্লী/জনপদে কর্মসূচি বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে বিনিয়োগ ব্যয় অনেক বেশি। ফলে, অতিদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনপদের মানুষ ঋণ কর্মসূচি তথা উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে অধিকতর দরিদ্রতার দিকে ধাবিত হবে।

১১.৪ তত্ত্বাবধায়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে

বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলীয়ভাবে কেন্দ্র/সমিতি ভিত্তিক পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সদস্য/গ্রাহকগণের নানামুখী কর্মব্যস্ততা ও বাস্তবতার কারণেই দলীয় পদ্ধতি বা এর প্রতিটি ধাপকে প্রতিপালন করা সম্ভব হচ্ছে না, যদিও প্রতিটি সদস্যের কাছে দলীয়/সমিতি পরিচয়টিই প্রধান হিসেবে বিবেচ্য। সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন করে সমিতিতে এসে লেনদেন/কিস্তি প্রদান করে এবং অধিকাংশ সময়ই সদস্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি আদায়ের ব্যাপারে নিয়মিত তাগাদা ও আর্থিক কর্মকান্ডের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হয়। যার ফলে, কর্মীদের সমিতি পরিচালনার শ্রম ঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে, কর্মী প্রতি উৎপাদনশীলতাও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উত্তীর্ণ করা বেশ দুরূহ। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১.৫ সামাজিক উন্নয়ন ব্যয় সংকুচিত হবে

গ্রাহকদের সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ MRA-এর অনুমোদন নিয়ে যে ব্যয় করে থাকে তা স্তিমিত হবে। যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকদের যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহযোগিতা করা হয় তা ব্যাহত হবে।

১১.৬ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের সংকট হবে

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থেকে অর্জিত লাভের একটি অংশ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড (Development Program) বাস্তবায়নে ব্যয় করে থাকে। এক্ষেত্রে অনেক নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। সার্ভিস চার্জের হার হ্রাস ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ও বর্তমানে চালু প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সম্পদের যোগানেই ব্যাঘাত ঘটবে।

১১.৭ গ্রাহকদের সঞ্চয় কমে আসবে

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের Equity/মূলধন সৃষ্টি হয় মূলত দুইভাবে– বিদেশী অনুদান এবং বাৎসরিক নিট লাভ থেকে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে বিদেশী অনুদান ২০০১ সাল থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। Equity/মূলধন বৃদ্ধির দ্বিতীয় পন্থা সংকুচিত হলে গ্রাহকদের নিজস্ব আর্থিক শক্তির উৎস অর্থাৎ সঞ্চয় কমে আসবে। কেননা সঞ্চয়কে MRA বিধিতে Equity/মূলধন এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১১.৮ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না

ক্ষুদ্রঋণ খাতে কর্মরত রয়েছে তিন লক্ষের অধিক কর্মী। নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন হয় কর্মসূচিকে সম্প্রসারণ করা। সম্প্রসারণ কাজ বাধাগ্রস্থ হতে পারে, ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ কমে আসবে। এছাড়া বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের চাহিদা পূরণে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা হারাবে।

১১.৯ তহবিল ব্যয় বৃদ্ধি পাবে

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর তহবিল যোগানে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আগের চেয়ে বেশি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু, ব্যাংক ঋণের শর্তপূরণে সংস্থাগুলোকে ২০%-৩০% গ্যারান্টি ফান্ড ও সহায়ক জামানত প্রদান করতে হয়। এর ফলে গৃহীত ব্যাংক ঋণের প্রায় ৩০% এর বেশী অংশ অবিনিয়োগকৃত থেকে যায়। অথচ ব্যাংক ঋণের পুরোটার উপরই সংস্থাগুলোকে সুদ পরিশোধ করতে হয়, ফলে প্রকৃত তহবিল ব্যয় কাগজে কলমে ঘোষিত ব্যয় থেকে অনেক বেশি গুণতে হয়।

১১.১০ নতুনত্ব আনায় বাধা হবে

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয় এর ভারসাম্য রক্ষা করতে যেয়ে নতুনত্ব বা Innovation-এর দিকে নজর কমে যাবে।

১২. শেষ কথা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক সৃষ্টি করে তদের সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে এবং এই গ্রাহকদের সিংহভাগই মহিলা। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকদের সংখ্যা ২.৬৮ কোটি (CDF, ২০১৯)। দরিদ্র মানুষকে (মহিলা) খুঁজে বের করা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কাজ। তাদেরকে সার্বিকভাবে তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ (Training) প্রদান করা হয়। তাদেরকে জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে প্রণোদনা (Motivation) দেয়া হয়। তাদের ভিতর আশার আলো (Hope) জাগ্রত করা হয়। তাদেরকে পথ নির্দেশনা (Way) দেয়া হয়। এ সকল কারণে একজন গ্রাহক তৈরি করতে অনেক সময়, শ্রম ও ব্যয় জড়িত থাকে। উপযোগী করে তৈরি করার পর সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচিকে উন্নয়নের অবলম্বন হিসেবে গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

নানাবিধ উপায়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন (Microfinance) কার্যক্রম পরিচালনা করে অর্থ উপার্জন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতাশালী করে তোলা। আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানুষের জন্য ও প্রয়োজনে তৈরি হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের তৈরিকৃত চার্টার প্রয়োজনের নিরিখে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন করে। কোন নিয়মের স্থায়ী বেড়াজালে বন্দী থেকে আর যাই হোক দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাদের কল্যাণে প্রয়োজনে নিয়ম প্রবর্তন বা পরিবর্তন করতে কোন অসুবিধা নেই।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, খরাসহ যে কোন ধরণের বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও তাদের কাজ বন্ধ রাখে না। আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবা প্রদানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণিত সকল কারণে সেবা মূল্য বেশি পড়ে এবং এ বিষয়ে সরকার এবং মানব কল্যাণের অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন এমন সবাই একমত হয়েছেন। সামাজিক এ কাজে উচ্চ মূল্য প্রয়োজন। তাই ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ (সুদ) নির্ধারণ সাধারণ কোন অংকের হিসাব নয়। এর সাথে জড়িত রয়েছে সামাজিক ব্যয়। ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি (Social Capital) গঠিত হচ্ছে - এটা আজ দৃশ্যমান। ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ নির্ধারণে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথাযথ বিবেচনার দাবী রাখে। ক্ষুদ্রঋণের নীতি-নির্ধারক মহল এ সকল বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা ও অনুধাবন এবং গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এটাই অন্যতম বৃহৎ এই খাত পরিচালনাকারীদের প্রত্যাশা।■

● লেখক : পরিচালক (অর্থ), বুরো বাংলাদেশ

এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ে ক্ষুদ্রঋণ

ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে

ড. আতিউর রহমান
অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

গণ মানুষের উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালের ৩ আগস্ট, জামালপুর জেলার এক কৃষক পরিবারে। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের SOAS University of London (The School of Oriental and African Studies) থেকে ১৯৭৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংকের ডিরেক্টর এবং জনতা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি 'উন্নয়ন সমন্বয়' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন।

প্রত্যয় : আপনি দেশের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআই সমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান : নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বিবর্তন, বিশেষ করে শুরুর দিনগুলোতে অর্থাৎ দেশের অগ্রযাত্রার শুরুর দিনগুলোতে যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ খাদ্য সঙ্কট ও দারিদ্র্যসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত ছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকতো, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পাকিস্তানের কারণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়, এমনকি খাদ্য সাহায্য পেতেও সমস্যা হচ্ছিল অর্থাৎ একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সে সময় সরকারের পাশাপাশি আমাদের অনেক সামাজিক সংগঠক বিশেষ করে স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী এরা সবাই ঐ সময় বেসরকারিভাবে বেশ কিছু উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা এই উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। বলা যায়, এই সংগঠকরা দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নতুন ধারার কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট শুরু করেন।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশে শুরুতে তারা বিদেশি সাহায্যের উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তারা এ কাজের জন্যে অনেকটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, এ কাজের জন্যে যে সুযোগ দেয়া দরকার তা তারা দিয়েছেন। কারণ তারা উপলব্ধি করেছেন একটি প্রাদেশিক সিস্টেমের সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানকার সরকারের জনশক্তির সেভাবে উন্নয়ন ঘটেনি, পুরনো আমলাদের দিয়েই সরকার পরিচালিত হচ্ছে, সব ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও দৃশ্যত কার্যকর ছিল না, বলতে গেলে সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল।

এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও নারীর ক্ষমতায়ন ছিল প্রধান। এক পর্যায়ে স্যার ফজলে হাসান আবেদ উপলব্ধি করলেন শুধুমাত্র বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য নিয়ে এত বড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। তিনি দেশের অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেখান থেকে বের করে আনার লক্ষ্যেই সঞ্চয় ও সঞ্চয়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি (অবশ্য আমি ক্ষুদ্র ঋণ বলতে চাই না) একটা নতুন ধরনের ঋণ ব্যবস্থা চালু করলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠন এবং গ্রামীণ ব্যাংকও সেই ধারণা দিয়ে সাজানো হয়েছে। এটি মূলত: ক্ষুদ্রঋণ নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব মডেল ঋণ অর্থাৎ সঞ্চয় ভিত্তিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন যা এ দেশেই প্রথম শুরু হলো।

ধীরে ধীরে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেশে সরকারি ব্যাংকসহ কৃষি ব্যাংক কাজ করলেও সহায় সম্বলহীনদের কাছে তাদের ঋণ সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, কারণ ব্যাংকগুলো জামানতবিহীন ঋণ দিতে পারতো না। তাছাড়া গ্রামীণ দরিদ্রদের ব্যাংকগুলো চিনতোও না। ঠিক সে মুহূর্তে নতুন ধারার এই অর্থায়ন শুরু হলো এবং দরিদ্র ও হতদরিদ্রগণ সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধা পেতে শুরু করলেন। এ অবস্থায় সরকার তাদের কার্যক্রম পরিচালনা বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করে দেয়। সরকার এই খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে এনজিও ব্যুরো এবং পরবর্তীতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করে।

এরই অংশবিশেষ দেশে হাজারের অধিক বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও বর্তমানে এমআরএ এর নিবন্ধনকৃত এনজিও/এমএফআই এর সংখ্যা ৭৫৯টি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এনজিওদের সাথে তফসিলি ব্যাংকগুলো ব্যাংক এনজিও লিংকেজ কর্মসূচি চালু রেখেছে। এরকম একটি সময়ে সরকার এবং

গ্রাহককে ব্যাংকে গিয়ে সেবা নিতে হয় আর এনজিওরা বাড়িতে গিয়ে সেবা প্রদান করে এবং প্রতি মুহূর্তে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে ব্যাংকের চেয়ে তাদের ব্যয় অনেক বেশি। আমরা বিভিন্ন সময় গবেষণা করে দেখেছি, এনজিওদের ফান্ড কস্ট বেশি পড়ে। সে কারণে তাদের নিজেদের টিকে থাকার জন্যেই ঋণের সার্ভিস চার্জ বেশি নিতে হয়।

এমএফআইগুলোর একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করলো সেন্ট্রাল ব্যাংক। এমআরএ'র সাথে যুক্ত হয়ে তারা হোলসেল প্রোগ্রাম বা লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম চালু করেছে, যার উন্নতিতে এখন এ খাতে ঋণ প্রবাহ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরেকটি বিষয় দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রক্রিয়ায় এখন যারা উদ্যোক্তা হিসেবে উঠে এসেছেন তারা ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই– মাঝারি আকারের উদ্যোক্তা হয়েছেন। যারা এক সময় ১০ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে খুশি ছিলেন, তারা এখন ১০ লাখ টাকা চাইছেন। কারণ তারা ক্রমাগত উন্নতি করছেন, সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহার করায় তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। এখন তাদের সেই চাহিদা পূরণ করতে গেলে এমএফআইগুলো তাদের সঞ্চয় থেকে দিতে পারছে না। এ জন্যেই তাদের ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। অর্থাৎ এনজিও-এমএফআই সমূহ দেশের অর্থনীতিতে একটা নীরব বিপ্লবের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রত্যয় : অনেকেই অভিযোগ করেন, এনজিও/এমএফআইসমূহ থেকে নেয়া ঋণের সুদ হার ব্যাংকের চেয়ে অত্যধিক, এতে গরিবরা আরো গরিব হচ্ছে– আপনার বক্তব্য কি?

ড. আতিউর রহমান : এনজিও/এমএফআই এর ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকেই এ অভিযোগ করা হচ্ছে। ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তবে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে যে উভয় প্রতিষ্ঠানই মার্কেট থেকে টাকা ক্রয় করে তা বেশি দামে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট বিক্রি করে। ক্রয় এবং বিক্রয়ের তারতম্যটুকুই তাদের লাভ যা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত থাকে।

এখানে ব্যাংকগুলো যেখানে কম খরচে টাকা ক্রয় করতে পারছে সেখানে এমএফআইগুলোকে অধিক মূল্যে তা ক্রয় করতে হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রাহককে ব্যাংকে গিয়ে সেবা নিতে হয় আর এনজিওরা বাড়িতে গিয়ে সেবা প্রদান করে এবং প্রতি মুহূর্তে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে ব্যাংকের চেয়ে তাদের ব্যয় অনেক বেশি। আমরা বিভিন্ন সময় গবেষণা করে দেখেছি, এনজিওদের ফান্ড কস্ট বেশি পড়ে। সে কারণে তাদের নিজেদের টিকে থাকার জন্যেই ঋণের সার্ভিস চার্জ বেশি নিতে হয়।

তবে এ কথাও ঠিক যে, দেশের তৃণমূল অভাবী দরিদ্র মানুষদের জন্য এমএফআই/এনজিওদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এর ফলে এ খাতের ৩ কোটি ৩০ লাখ গ্রাহক সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছেন। এটি স্পষ্ট যে, এই উদ্যোক্তাদের সৃষ্টি হয়েছে এনজিও/এমএফআইদের ক্ষুদ্র আকারের অর্থায়ন থেকেই। স্বাভাবিকভাবে দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআই সমূহ ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কারণ, এই ঋণ গ্রহীতারা দ্রুতই ঋণ পেয়ে থাকেন এবং তাদের স্বকর্মসংস্থানতো বটেই, অনেকেই আবার ছোট খাটো কারখানা বা ফার্ম করে একাধিক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

তবে এটাও ঠিক যে, ব্যাংকগুলো যদি ৯% এ ঋণ দিতে পারে আর যদি এনজিওরা সেখানে ২৪% চায় তাহলে একটা প্রশ্ন উঠবেই যে কেন এতো পার্থক্য। সেক্ষেত্রে দুটো কারণ উল্লেখ করতে হবে যে আমাদের কস্ট অব ফান্ড বেশি, ব্যাংক যে অর্থ ৫%-৬% এ পাচ্ছে আমরা তা পাচ্ছি না, আমরা ব্যাংক থেকে যখন অর্থ সংগ্রহ করি তখন তাদের প্রায় ৯% দিতে হয় এবং আমরা ঋণ গ্রহীতাদের ঘরে ঘরে ঋণ পৌঁছে দেই–এ জন্যে ব্যাংকের চেয়ে অধিক লোকবলের প্রয়োজন হয় এবং খরচও পড়ে অনেক বেশি। কিন্তু সেখানেও একটি বিষয় পর্যালোচনা করতে হবে, সেই যে বেশি খরচ তা কতোটা বেশি?

অনেকেই বলতে পারেন সেই মার্জিন কি কমানো যায় না? কমানোর জন্যে আইসিটি পদ্ধতি কি ব্যবহার করা যায় না, বাড়িতে বাড়িতে কর্মী না পাঠিয়ে এরকম অনলাইনে কি এই কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না? অনলাইনে উঠোন বৈঠক এবং যোগাযোগ করা হলে খরচ অনেক কমে আসবে। আমি মনে করি এমএফআইগুলোকে এটি ভাবতে হবে এবং ফান্ডিং ও পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে।

এতে অবশ্য আরেকটি সমস্যা দেখা দেবে, এনজিও খাতে যে তরুণ শক্তি কাজ করছে তাদের চাহিদা কমে যাবে, নতুন নিয়োগ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এ জন্য এমএফআইগুলোকে নতুন নতুন প্রোডাক্ট বা বিনিয়োগ খুঁজে নিতে হবে। যেমন ব্র্যাক স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য অনেক সোস্যাল সার্ভিস দিচ্ছে অর্থাৎ এমএফআইদের কাজের পরিধি বাড়াতে হবে। কার্যক্রমকে ডাইভার্সিফাইড করতে হবে। এটা করতে হবে সবার স্বার্থেই। কারণ, সরকার এককভাবে সবকিছু করতে পারবে না– পারা সহজও হবে না। সুতরাং এনজিও/এমএফআই খাতের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তাদেরকে টিকে থাকতে হবে। তাদের নতুন নতুন প্রজেক্ট নিতে হবে যাতে এখাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হয়।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়, আগামী দু'তিন বছর আমাদের কোভিডের মধ্যেই কাজ করতে হবে এবং কোভিড উত্তর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি দাঁড়াবে তা নিয়ে ভাবতে হবে। করোনাভাইরাস আমাদের নতুন অনেক কিছুই এনে দিয়েছে। যেমন এই যে আমরা অনলাইনে জুমে পরস্পর কথা বলছি, মিটিং করছি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহকদের সাথে মিটিং করতে পারে, ঋণের কিস্তি আদায়ের তাগাদা দিতে পারে তাহলে কিন্তু ব্যয় অনেক কমে যাবে। আর ব্যয় কমে আসলে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের আরেকটু কম দামে সেবা দিতে পারবে। আমাদের ভাবতে হবে আগামী ২/৩ বছর কোভিডের মধ্যেই কাজ করতে হবে। কোভিড উত্তর পরিস্থিতির প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি প্রযুক্তিগত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন এর জন্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন–

ড. আতিউর রহমান : অবশ্যই। সকল কর্মীদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে হবে। তাদেরকে আইটি বিষয়ে পারদর্শী করতে হবে। এটা করা খুবই সম্ভব এবং এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এভাবেই এই খাতকে আমরা টেকসই অর্থায়ন কর্মসূচি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

সরকার অবশ্যই বুঝে যে আপনারা তাদের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছেন। একটি সরকারে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অবস্থান। সবাইতো এনজিও খাত সম্পর্কে অবহিত নন! আমি যেমন আপনাদের সম্পর্কে জানতাম বুঝতাম, তারা কিন্তু বুঝবে না। তাদের বুঝাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তাদের বুঝাতে যথাযথ নেতৃত্ব প্রয়োজন, আপনাদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের ঘাটতি দেখতে পাই। দুর্বলতা দেখতে পাই, সরকারের সাথে বসার মতো, সমস্যা-সম্ভাবনার কথা বলার জন্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। কিংবা কোনো মেকানিজম গড়ে তুলতে পারেননি। একটি উদাহরণ দেই, গতকাল আমি ফরিদপুরের ডিসি সাহেবের সাথে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, স্যার আমি এনজিওদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি বলেই করোনা কাল ও তৎপরবর্তী খাদ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কাজে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। এনজিওরা এখানে বেশ ভালো কাজ করছে। আমি তাকে বলি, তোমার এই কথাতো সর্বত্র জানতে পারছে না। সে জানালো–এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আমি এখানে এনজিওদের সাথে পার্টনারশিপে অনেক ভালো কাজ করতে পারছি। সেই মডেলটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সরকার এবং জনগণ প্রত্যেকের স্বার্থে এটি করা উচিত। সরকারের সব কাজ একা একজন ডিসি বা ইউএনও'র পক্ষে করা সম্ভব নয়। একটা জেলায় একজন ডিসি, একটা উপজেলায় একজন ইউএনও– সেক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা পালন ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

প্রত্যয় : এই সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে এফএনবি, সিডিএফ, ইনাফি আছে। আপনার দৃষ্টিতে নেতৃত্বের ঘাটতিটা কোন জায়গায়?

ড. আতিউর রহমান : এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে একমাত্র সিডিএফ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কেউ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। অর্থাৎ অন্যেরা তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারছে না। সিডিএফ পারছে কারণ, আমি কিছু ঐতিহ্য রেখে এসেছি, এ জন্যে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে কাজ করতে পারছে, এমআরএ'র সাথে কাজ করতে পারছে। সে কারণে তাদের লেজিটিমেসি গড়ে উঠেছে। আমি মনে করি সফল এমএফআই এর উচিত সিডিএফকে আরো সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়া। সিডিএফ সরকারের সাথে আরো ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এবং এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারলে গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে এরা ভালোভাবে কাজ করছে তখন সরকারও এদের ভালো চোখে দেখবে। এ জন্যে সিডিএফ-এর সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। সিডিএফ এর যে ডিপ্লোমেসি সেখানে এখনো স্মার্টনেস এর অনেক অভাব আছে। আমি মনে করি, সিডিএফ এ বাইরে থেকে ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর নিয়ে আসতে হবে যার গ্রহণযোগ্যতা সরকারের নিকট রয়েছে। এরা এক সময় আমাকে তাদের চেয়ারম্যান করেছিল। এই পথটা তৈরি করতে হবে। এরকম কাউকে আনতে হবে যিনি সমাজে গ্রহণযোগ্য এবং রাষ্ট্র এবং সরকারের কাছেও গ্রহণযোগ্য।

আমি মনে করি সিডিএফসহ এনজিও খাতের অন্যান্য সংগঠনে সিভিল সোসাইটির গ্রহণযোগ্য কাউকে নেতৃত্বে আনা প্রয়োজন যিনি সরকারের কাছেও হবেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এতে করে এনজিও/এমএফআই খাতের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনার পথ সুগম হবে বলে আমি মনে করি। আমি উদাহরণ দিচ্ছি, শফিক ভাই চলে যাওয়ার পরও আশা এখনো ভালো করতে পারছে, কারণ সাবেক ক্যাবিনেট সচিবকে

তারা সামনে রেখেছে। এরকম একজনকে সিডিএফ এর প্রধান হিসেবে রাখতে হবে। আজকেই করতে হবে তা নয়, আমি মনে করি প্রয়োজনের আলোকেই ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থাৎ স্মার্ট ডিপ্লোমেসি করতে হবে। সরকারকে বুঝতে হবে খরচটা কেনো বেশি, খরচ কমাতে সরকারের পক্ষ থেকে কি কি সহযোগিতা দরকার।

আমি আরো মনে করি, পিকেএসএফ এর সাথেও সিডিএফ এর সম্পর্ক আরো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। পিকেএসএফ অনেক সময় সিডিএফকে ততোটা গুরুত্ব দিতে চায় না। এ দুটো প্রতিষ্ঠানই একই স্পেসে কাজ করছে। আমার সময়ে আমি এক সাথে বসাতে পারতাম, এখন সে অবস্থা নেই। কিন্তু এক সাথে কাজ করা দরকার। দুটো সেক্টরের কাজের ধারা যেহেতু একই সুতরাং তাদের মধ্যে সমন্বয় অবশ্যই জরুরি। সরকারকে বুঝাতে হবে, আপনারা যে কাজ করতে চাচ্ছেন আমরা তৃণমূল পর্যায়ে সেই কাজটা কম খরচে করে দিচ্ছি। সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষও তখন এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রত্যয় : সম্প্রতি সিএসও অ্যালায়েন্স গঠিত হয়েছে যেখানে সিভিল সোসাইটি ও এনজিও সেক্টরের সবাই আছেন। আপনি একে কিভাবে দেখছেন? এই অর্গানইজেশন কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

ড. আতিউর রহমান : আমি দেখেছি। এটি নিঃসন্দেহে ভলো উদ্যোগ। তাঁরা সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সাথে কাজ করতে পারে। সরকার নিজে যেটা পারে না, আমি মনে করি এই সিএসও অ্যালায়েন্স সেই উদ্যোগ নিতে পারবে। আমি তাদের সম্পর্কে জানি, যদি তারা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগোয় তাহলে অনেক ভালো কাজ হবে। কথায় কথায় সরকারের সমালোচনা নয়, কারণ শুধু সমালোচনা করে কোনো কাজ করা যায় না। বরং এভাবে দেখা উচিৎ যে এ পর্যন্ত সরকার কী করেছে এবং আরো কি করা যায়। অর্থাৎ সরকারের উন্নয়নের পার্টনার হিসেবে কাজের মনোভাব থাকতে হবে।

আমার শুধু ভয় হয়, এই সিএসও অ্যালায়েন্স কখনো না আবার কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা বলে বসে– একবার বলে ফেললে সন্দেহের সৃষ্টি হবে এবং তখন আর ভালো কিছু করেও এগোনো যাবে না। এটিকে উন্নয়ন অংশীদারদের একটা প্লাটফর্মে পরিণত করতে হবে। আমার মনে আছে, এক সময় জিও-এনজিও একটা প্লাটফর্ম ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব হিসেবে জাকিয়া আপার সভাপতিত্বে বেশ কিছু মিটিং হয়েছে। সেই কাঠামোটা কোথায় হারিয়ে গেলো? সেই কাঠামোটার পুনর্জাগরণ করা যায় কি না– হলে এই সেক্টর অনেক লাভবান হবে বলে আমি মনে করি। সেই কাঠামোটা উদ্ধার করা দরকার।

অবশ্য সিএসও অ্যালায়েন্স কিছু কিছু কাজ করছে। এটি আইএনজিও'র সাথে কাজ করছে। এক্সেস টু ইনফরমেশন নিয়ে যদি তারা কাজ করে তাহলে একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআই সমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান : আমি মনে করি সক্ষম এমএফআইগুলোকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া যায়। তবে সমস্যা হচ্ছে যে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে ব্যাংকের সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে যে, আরো কিছু ব্যাংক যুক্ত করলে একটা অরাজকতা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে, এতোগুলো ব্যাংক না দিয়ে ৮টি বা ১০টি বড় এনজিও/এমএফআই যারা ৮০% মার্কেটকে কভার করে তাদেরকে নিয়ে একটা ব্যাংক করা যেতে পারে। এই ৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের ১০% করে শেয়ার থাকবে এবং ২০% শেয়ার পাবলিকলি বা সরকার নিতে পারে, বিভিন্ন ব্যাংক নিতে পারে। এরকমভাবে একটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হবে। এটি সেন্ট্রাল ব্যাংকের অধীনেই যাবে যেমন এনআরবিদের ব্যাংক দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এটিও এনজিও/এমএফআই খাতের ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পাবে। মূলতঃ তাদের কাজ হবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের জন্য। তবে ব্যাংক হিসেবে তারা অন্যান্য ব্যাংকের মতোই কাজ করবে। আমি মনে করি, ভারতের বন্ধন ব্যাংকের মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। বন্ধন একসময় এমএফআই প্রতিষ্ঠান ছিল, পরে গ্রাজুয়ালি তারা বন্ধন ব্যাংক হয়েছে এবং বন্ধন ব্যাংক হবার পরেও তারা মূল 'বন্ধন' এর সাথে সম্পর্ক ছেদ করেনি। বরং এটা একটা রিলেশনশীপ তৈরি করেছে যে তাদের ব্যাংকিং প্রোডাক্টগুলো এনজিও বন্ধন এর গ্রুপগুলো অর্থাৎ সদস্যরা সঞ্চয় এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমি মনে করি বন্ধন মডেলটা দেখে এরকম একটি ইনোভেটিভ প্রপোজাল সরকারকে দেয়া যেতে পারে।

ভারতে বন্ধন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে আমি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। বন্ধন এর প্রধান চন্দ্রশেখর এসে বললেন, স্যার আপনার মূল্যবান পরামর্শ আমাদের প্রয়োজন। সে সময় আমি তাদের সহযোগিতা করেছিলাম। এখন ভারতে এটি একটি অন্যতম ব্যাংক। তারা টপ আইটিদের পার্টনার হিসেবে নিয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল লিডিং এজেন্সি– তাদের সহযোগিতা নিয়েছে। তারা ব্যাংক-এনজিও লিঙ্কেজের কাজ করাসহ এলসি থেকে শুরু করে ব্যাংকিং সকল কাজই করছে।

আমি আবারও বলছি, সকল সক্ষম এমএফআইগুলো আলাদা আলাদা ৮/১০টি ব্যাংকের প্রস্তাব না দিয়ে সম্মিলিতভাবে ১টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের প্রস্তাব দিলে সরকার সম্মত হতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রত্যয় : আপনি জানেন ইতোমধ্যে গ্রামীন অর্থনীতি বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু ব্যাংকগুলোতে সঞ্চয় করার মতো সুযোগ অনেক মানুষেরই নেই। সেক্ষেত্রে এমএফআইগুলোতে গ্রামীন সঞ্চয় বেশি রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কি না?

ড. আতিউর রহমান : অবশ্যই। এক্ষেত্রে এমআরএ'র নীতিমালায় কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এমএফআইগুলো যাতে ব্যাংকের মতোই চলতে পারে এমন কিছু সুবিধা চালু করা উচিৎ। এতে করে এমএফআইগুলোর আর্থিক সক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে।■

আমি মনে করি সক্ষম এমএফআইগুলোকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া যায়। তবে সমস্যা হচ্ছে যে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে ব্যাংকের সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে যে, আরো কিছু ব্যাংক যুক্ত করলে একটা অরাজকতা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে, এতোগুলো ব্যাংক না দিয়ে ৮টি বা ১০টি বড় এনজিও/এমএফআই যারা ৮০% মার্কেটকে কভার করে তাদেরকে নিয়ে একটা ব্যাংক করা যেতে পারে।

সামর্থ্যবান ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা

পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছি

মো. ফসিউল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ

দেশের মেধাবী ও কৃতি সন্তানদের একজন মো. ফসিউল্লাহ ২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদ থেকে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) ছিলেন। তাঁকে এ পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আলোকিত ব্যক্তিত্ব মো. ফসিউল্লাহর জন্ম ১৯৬১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার হাতীখলা গ্রামে। তাঁর পিতা মরহুম মো. আক্কাস আলী এবং মা সুফিয়া বেগম। ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র মো. ফসিউল্লাহ ১৯৭৮ সালে গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৮০ সালে গফরগাঁও সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাজীবনের শুরুতে একাধিক কলেজে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি সহকারী কমিশনার হিসেবে ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করেন। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে তিনি মাঠ পর্যায়সহ যখন যে দায়িত্ব পেয়েছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি গ্রেড-১ হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি মনে করেন, সরকারি বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তাহলে এ দেশের উন্নয়ন অতি দ্রুত সম্পন্ন হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব মো. ফসিউল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন।

তিনি তাঁর কর্মজীবনে এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, সিডা, সেভ দ্যা চিলড্রেন, জাইকা, ইইউ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ডিএফআইডি, ইউএস এইড, অস এইড, কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক এবং ইউএনএইচসিআর এর কার্যক্রমের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান। এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্বনির্ভর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা–যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চলছে। লক্ষ্য অর্জনে এনজিও/এমএফআই সমূহের কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।

মো. ফসিউল্লাহ : এ বছর আমরা উদযাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং মহান স্বাধীনতার 'সুবর্ণ জয়ন্তী'। প্রথমেই জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি প্রিয় স্বাধীনতা, প্রিয় বাংলাদেশ। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই সকল বীর শহীদদের এবং সম্ভ্রম হারানো মা বোনদের। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে গঠিত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশে দেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন এমএফআই এর বিস্তৃতি ঘটেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই স্বনির্ভর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রান্তিক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগ্যোন্নয়নে ছোট বা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের জামানত ও সুদবিহীন ঋণ প্রদান বা অর্থায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই প্রেক্ষিতে Rural Social Service (RSS) প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম সুদ ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে গঠিত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশে দেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন এমএফআই এর বিস্তৃতি ঘটেছে।

পরবর্তীতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেই এ খাতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করে সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের আইন দ্বারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ৭৪৬টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) প্রায় ২২ হাজার শাখার মাধ্যমে ৩ কোটি ৩৩ লাখের বেশি গ্রাহককে আর্থিক সেবা প্রদান করছে। এ খাতে বার্ষিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৭ শতাংশ। বাৎসরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ সহ দুর্যোগ মোকাবেলা, স্বাস্থ্য–শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে আরো উন্নয়ন করতে হবে।

প্রত্যয় : একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন দেশের উন্নয়ন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সেক্টরের উন্নয়নে আপনি কি কি উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবছেন? আপনি কি মনে করেন, বিশাল এই সেক্টরের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এমআরএ'র কাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি?

মো. ফসিউল্লাহ : বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিকরণে এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিরলসভাবে কাজ করছে। এ বিশাল সেক্টরের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং উন্নয়নে নিয়মিত যোগাযোগ, পরামর্শ প্রদান, পরিদর্শন, ডিজিটালি তথ্য আদান-প্রদান ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এজন্য পুরো ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন করতে হবে। ইতোমধ্যে MF-CIB (Micro Finance-Credit Information Bureau) অনলাইনে পরিদর্শন, ন্যাশনাল ডাটা বেইজে সকল মাইক্রোফাইন্যান্স তথ্য সংগ্রহ, এমআরএ'র প্লাটফর্মে সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করে সমন্বিত মাইক্রোফাইন্যান্স সফটওয়্যার প্রস্তুত এবং ডিজিটালি লেনদেনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনলাইনে সনদ প্রদান, পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় উপযুক্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গবেষণা করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সীমিত জনবল নিয়ে এমআরএ'র যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চেয়ারম্যান করে ৮ সদস্যের পরিচালনা বোর্ড এবং ইভিসি'র নেতৃত্বে দুই জন নির্বাহী পরিচালক, ৫ জন পরিচালকসহ ১৩৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করছেন। সম্প্রতি প্রয়োজনীয় লোকবলসহ আইসিটি শাখা চালু হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নিজস্ব ভূমিতে অফিস এর ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার এ বিশাল সেক্টরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এমআরএকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সব বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হবে বলে আমি মনে করি।

প্রত্যয় : আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এমএফআইসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইন বিধির বেশ কিছু সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন সঞ্চয়ের উপর বিধি-নিষেধ, লোন-লস প্রভিশনের (এলএলআর) হার ও সঞ্চয়ের উপর তারল্য রাখার হারকে অনেক এনজিও-ই অধিক মনে করছে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে এসব বিধি-নিষেধ সংস্কার করে এমএফআই বান্ধব করার কোনো পরিকল্পনা আপনারা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিচ্ছেন কি না?

মো. ফসিউল্লাহ : এসব বিষয় পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। সেক্টোরাল মিটিংসহ সংশ্লিষ্ট

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করা হচ্ছে। অনেক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে বিবেচনাধীন আছে। গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ খাতের টেকসই উন্নয়নে বিধি বিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সংশোধন ও সংযোজন অব্যাহত আছে। এটি আরো জোরদার করা হবে। এমআরএ রেগুলেটরের দায়িত্বের পাশাপাশি এ খাতের উন্নয়ন কাজ করছে।

প্রত্যয় : সারাদেশে এমএফআইগুলোর প্রায় ২২ হাজার শাখা অফিস বিদ্যমান। কাজের সুবিধার্থে এই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অটোমেশন করা প্রয়োজন। একই সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এমএফআই সমূহের টিকে থাকার প্রশ্নে কমপ্লায়েন্স অর্জনে আপনাদের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন– এসব ব্যাপারে কি উদ্যোগ নিচ্ছেন?

মো. ফসিউল্লাহ : এ বিশাল খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করে দেশকে

দারিদ্রমুক্ত করে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাইজেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন MF-CIB-এর মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। গ্রাহকদের এনআইডি নম্বরসহ অন্যান্য সকল বিষয় অনলাইনে যাচাই করা হবে। এমআরএ'র প্লাটফর্মে সকল তথ্য সংরক্ষিত হবে। ব্যাকআপ হিসেবে সকল তথ্য রিকভারি ডাটা সেন্টারে রাখা হবে। অটোমেশনের মাধ্যমে সেন্টারের জবাবদিহিতা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হবে। সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক এর আওতায় থাকবে।

প্রত্যয় : লক্ষ্যণীয় বিষয়, একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিক এমএফআই এর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে, যা ঝুঁকিপূর্ণ ঋণে পরিণত হবার আশংকা থাকে। এ জন্য ইতোমধ্যে আপনারা সিআইবি সিস্টেম প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটি কবে নাগাদ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আপনি মনে করেন?

মো. ফসিউল্লাহ : ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে বহুল প্রত্যাশিত MF-CIB এর পাইলটিং চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ দায়িত্বে রয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পাইলটিং সম্পন্ন হবে এবং পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে সারাদেশে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। এটি হবে সারা দুনিয়ায় একটি বৃহত্তম CIB। এটি সম্পন্ন হলে আশা করছি এ খাতের কার্যক্রম ঝুঁকিমুক্ত থাকবে এবং আরো কার্যকর হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

মো. ফসিউল্লাহ : এমআরএ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জ ছিল ৩৫% এর উপর। এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। ঋণের সুদের পরিবর্তে এ খাতে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রথমে ২৭% এবং ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ২৪% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে হ্রাসকৃত ব্যাংক ঋণের সুদ হার এবং কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় সার্ভিস চার্জ আরো কমিয়ে আনার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলোচনা-পর্যালোচনা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআই সমূহকে কি প্রক্রিয়ায় তহবিল গঠনে সাহায্য করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

মো. ফসিউল্লাহ : ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কার্যক্রমের বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেক্টরের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক এই মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, খাদ্য সেবাসহ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কর্মসূচি হিসেবে এমআরএ'র নেতৃত্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো 'বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি' চালু করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অতি নিকটে থেকে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। এটি এ খাতের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য। সরকার ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আয় আয়করমুক্ত করেছেন। ব্যাংকের আলাদা নিয়ম-কানুন। দেশের অনেক ব্যাংক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিয়োজিত।

সরকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ খাতকে সহায়তা করে যাচ্ছে। সক্ষম ও বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসারে পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহে এমআরএ অনুমতি প্রদান করছে। অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল সহায়তায় এমআরএ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের ভিশনকে সামনে রেখে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে 'মুজিব বর্ষের উপহার, ক্ষুদ্র অর্থায়নে দারিদ্র্য মুক্তির অঙ্গীকার' শীর্ষক স্লোগান বাস্তবায়নে এমআরএ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা আরো এগিয়ে যাবো।■

উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণ

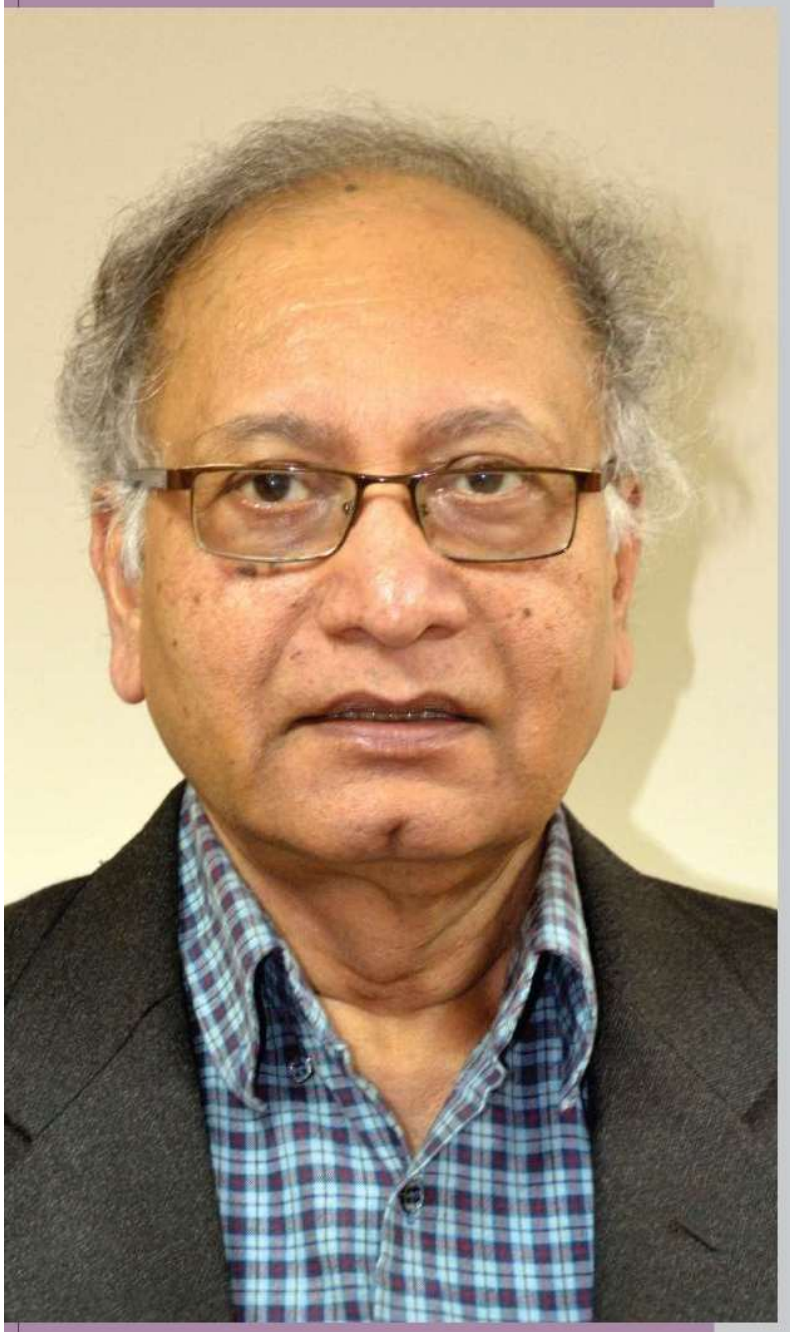

গ্রামীণ আর্থিক বাজারকে শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM)

এনজিও সেক্টরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান Institute for Inclusive Finance and Development (InM) এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. মোস্তফা কে. মুজেরী দেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব। তিনি ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি আইএনএম এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদানের আগে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এর ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

একজন পেশাজীবী হিসেবে তিনি কম্বোডিয়ার ইউএনডিপি'র পোভার্টি মনিটরিং অ্যানালাইসিস এডভাইজার, বাংলাদেশের মাইক্রো ইমপ্যাক্ট অব মাইক্রো ইকোনমিক অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসিস (MIMAP) প্রজেক্ট লিডার, CIRDAP এর গবেষণা পরিচালক, ব্রিসবেন এর কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভগের অতিথি শিক্ষক, বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশনের জাতীয় বিশেষজ্ঞ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কৃতিছাত্র ড. মুজেরী ১৯৭৮ সালে McMaster University of Canada থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন। তিনি ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এনজিও সেক্টরসহ জাতিসংঘ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক, দ্বিপাক্ষিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি বিশ্বের অনেক দেশে উন্নয়ন খাতের আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে তার প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি পোভার্টি এবং এমডিজি'র মনিটরিং এবং অ্যানালাইসিস ম্যাক্রো পলিসি অ্যানালাইসিস এবং স্ট্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ, উন্নয়ন পলিসিতে কোয়ানটিটেটিভ টেকনিকস, পাবলিক পলিসি অ্যানালাইসিস, টেকসই রুরাল অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট, সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, পোভার্টি রিডাকশন স্ট্রাটেজি ফরমুলেশন এবং পলিসি/প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যাল্যুয়েশন অব প্রোগ্রাম/প্রজেক্টস এবং মনিটরিং পলিসি অ্যানালাইসিস কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এই প্রজ্ঞাবান অর্থনীতিবিদ, প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : আপনি আইএনএম এর নির্বাহী পরিচালক। আপনার দৃষ্টিতে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআই সমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে মনে করেন?

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ মূলত একটা মানবিক এবং জনহিতকর ধারণা হিসেবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই এর সাথে উন্নয়নের মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং এনজিও-এমএফআইগুলো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার এ পরিণত হয়েছে। এই উত্তরণ যে একেবারে সরলরৈখিক তা কিন্তু নয় বরং এ প্রক্রিয়া অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। এক সময় যা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে শুরু হয়েছিল তা ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী একটি সাধারণ সেবা, এখন তা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে যা বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে যেমন সঞ্চয়, স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্রবীমা, অন্যান্য আর্থিক সেবার পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন ।

স্বাধীনতার পর প্রাথমিক দুর্যোগগুলো কাটিয়ে বাংলাদেশ বিগত পঞ্চাশ বছরে উন্নয়নে অনেক অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বিশ্বের ৪১তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, এবং ২০৩৩ সালের মধ্যে তা বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের দৃষ্টি আকর্ষক এই পরিবর্তনের একক ব্যাখ্যা নিতান্তই অবাস্তব, বরং সকল বড় বড় ঐতিহাসিক রূপান্তরের মতো বাংলাদেশের এই দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নের অনেক চালিকাশক্তি রয়েছে। তবে একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর মূলত সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেক ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী সাফল্যের উদাহরণ ও সমস্যা সমাধানের কথা বলা যেতে পারে– যেমন এনজিও-এমএফআই ও সরকার কর্তৃক নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন নিবিড় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি; নারী শ্রম নিবিড়, রপ্তানি ভিত্তিক পোশাক শিল্প; এবং শ্রম অভিবাসন ও অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্সের মাধ্যমে আয় উপার্জন এবং মানব পুঁজির বিকাশ উন্নয়ন যা পরিবার এবং সম্প্রদায় উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের শিক্ষিত করতে ও নারীদেরকে আরও জোড়ালো ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে এনজিও-এমএফআইগুলো তৃণমূল পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে যা পরবর্তিতেও বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যেমন "মাইক্রোক্রেডিট প্লাস প্লাস" ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি। এগুলো মাইক্রো ও ম্যাক্রো স্তরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয় স্তম্ভ তৈরি করেছিল যা বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং যা বাংলাদেশের দ্রুত রূপান্তরকে সম্ভব করেছে। এই মাইক্রো ও ম্যাক্রো স্তরের সংযোগ দ্বারা সামাজিক পুঁজির বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া তা আমাদের সনাতন উন্নয়ন তত্ত্বে এখন পর্যন্ত অনেকটাই অস্বীকৃত রয়ে গেছে। আমি মনে করি, এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন যাতে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এনজিও-এমএফআই সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায়ের পরিবর্তনের যে মূল্যবান ভূমিকা তা সঠিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং বাংলাদেশ ও আমাদের মতো দেশগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়।

প্রত্যয় : শুরু থেকেই বাংলাদেশ ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। দেশের এনজিও/এমএফআই খাত দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কতোটা সফল হয়েছে–আপনার মূল্যায়ন কি? এ ব্যাপারে আর কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে দরিদ্র নারীদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে, বিশেষ করে এনজিও-এমএফআইগুলোর মাধ্যমে। তবে এ ধারণা যে একেবারে প্রশ্নাতীত তা কিন্তু নয়। ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য লাঘবে স্বল্পমেয়াদী ভূমিকা পালন করতে পারে তবে এটি সম্ভবত দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সকল ক্ষেত্রে কোনো দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়, বিশেষভাবে এমন অবস্থায় যেখানে দরিদ্র পরিবারগুলোর খুব সামান্য পরিমান জমি আর অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্ষুদ্রঋণে সফলতা দুটি অনুমানের উপর নির্ভর করে : প্রথমত, দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো পুঁজির অভাব; দ্বিতীয়ত, দরিদ্ররা গ্রহণযোগ্য শর্তে মূলধন সংগ্রহ করতে অক্ষম। এই অনুমানগুলো সঠিক হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধন ঋণ প্রদান অনেকটাই সহজ। কিন্তু বাস্তবে দারিদ্র্য কিন্তু বহুমাত্রিক যা বিমোচনে শুধুমাত্র ঋণ বা একক কোন নীতি সমাধান দিতে পারে না।

সকল ব্যয় বিবেচনায় বাংলাদেশের এমএফআইগুলোর গড় ব্রেক ইভেন রেট যা ফ্লোর ইন্টারেস্ট রেট হিসেবে ধরা যায় তা দাঁড়ায় ২১-২৩%। কিন্তু সরবরাহের দিক থেকে সুদের হার নির্ধারণের একটি প্রাথমিক সমস্যা হলো এটি এমএফআইগুলোর পরিচালন দক্ষতার স্তরটিকে বিবেচনা করে না। এর জন্য একটি মানদন্ড ঠিক করা উচিত যা দক্ষ এমএফআইগুলোর ব্যয় কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। এটি বাংলাদেশের এমএফআইগুলোর পরিচালনায় অদক্ষতার মাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করবে।

এ সকল উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে এনজিও-এমএফআই এর ভূমিকা কিন্তু বহুমাত্রিক আকার ধারণ করেছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন এমএফআইগুলো তাদের কার্যক্রমে দুটি সমস্যা মোকাবেলা করছে: প্রথমত, প্রাপ্ত তথ্য সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, ব্যয় সমস্যা। ক্ষুদ্রঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে কীভাবে কার্যকর উপায়ে পরিচালনা ব্যয় হ্রাস করা যায় তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রত্যয় : আপনি বলছেন বহুমাত্রিক আকার ধারনের কথা। বিষটি সম্পর্কে বলুন–

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : আমি বলবো, সময়ের সাথে সাথে এমএফআইগুলো তাদের কার্যক্রমে একটি ভারসাম্য অর্জন করার চেষ্টা করছে। যেমন: পুরনো গ্রহীতাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাদের কিছুটা বড় ঋণ প্রয়োজন (যেমন: মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ঋণ/একাধিক ঋণ) যা ব্যয় সমস্যাকে সহজ করে এবং আর্থিক টেকসই আস্থা অর্জনে সহায়তা করে। এটি অবশ্য ছোট ঋণগ্রহীতাদের বঞ্চিত হওয়ার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আবার স্বল্প ঋণ প্রয়োজন এমন নতুন গ্রহীতাদের উপর অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ব্যয় এবং ঝুঁকি দুটোই বৃদ্ধি পেতে পারে। যার ফলে আর্থিক স্থায়িত্ব অর্জন করা কঠিন হতে পারে অর্থাৎ এ দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে ট্রেড অফ বিদ্যমান যার মধ্যে এমএফআইগুলোর ভারসাম্য আনয়ন একান্ত প্রয়োজন।

স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব বাংলাদেশে ও অন্যান্য দেশেও বেশ ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে মোটামুটি একটা ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। প্রথমত, জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সঞ্চয় ব্যবহার বা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবেলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ এই হতে পারে যে জরুরি পরিস্থিতিতে উৎপাদনশীল সম্পদ যেমন: জমি বা পশুসম্পদের আপদকালীন বিক্রির প্রয়োজন হয়

না ফলে আয়ের প্রবাহ ব্যাহত হয় না। দ্বিতীয়ত, সারা বছর ব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা যায় যাকে ভোগের সহজলভ্যতা বলা যেতে পারে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কায়িক শ্রমই গরীব পরিবারগুলোর জন্য অর্থের মূল উৎস। তৃতীয়ত, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি। গ্রামীণ পরিবারগুলোর উৎপাদন, ভোগ এবং বিনিয়োগের এই বর্ধিত ক্ষমতা এমএফআইগুলোর ঋণ এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ এ রকমের সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তব করে তোলে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতে এমএফআইগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হলো

পৃথক পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবগুলো তাদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে তা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছে প্রসারিত করা। ধাক্কা মোকাবেলার স্বতন্ত্র ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে এর ফলে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর সহ-বৈকল্পিক ধাক্কার প্রভাব হ্রাস পাবে, যখন জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অনুপাত আর্থিকভাবে সক্ষম থাকবে। তদুপরি আর্থিক সম্পদে সঞ্চয় বাড়ানো মানে শূন্য বা নিম্ন উৎপাদনশীলতার সাথে ধন-সম্পত্তিতে সম্পদ সঞ্চয় করা থেকে সরে আসা। এটি ২০৪১ সালের মধ্যে কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরকে সমর্থনের মাধ্যমে গ্রামীণ রূপান্তরে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা প্রসারিত করবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : ১৯৭০ এর দশকে সূচনা লগ্ন থেকেই ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রমের উচ্চ সুদের হারের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। এমএফআইগুলো সাধারণত ঋণ দানের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে যেমন: তহবিলের ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, খারাপ ঋণের বিধান, কর ব্যয়, ঋণগ্রহীতাদের ঋণের হার এবং মূলধনের হার। প্রাপ্ত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সকল ব্যয় বিবেচনায় বাংলাদেশের এমএফআইগুলোর গড় ব্রেক ইভেন রেট যা ফ্লোর ইন্টারেস্ট রেট হিসেবে ধরা যায় তা দাঁড়ায় ২১-২৩%। কিন্তু সরবরাহের দিক থেকে সুদের হার নির্ধারণের একটি প্রাথমিক সমস্যা হলো এটি এমএফআইগুলোর পরিচালন দক্ষতার স্তরটিকে বিবেচনা করে না। এর জন্য একটি মানদন্ড ঠিক করা উচিত যা দক্ষ এমএফআইগুলোর ব্যয় কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। এটি বাংলাদেশের এমএফআইগুলোর পরিচালনায় অদক্ষতার মাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে একটি মানদন্ড নির্ধারণ করা যেতে পারে যা এমএফআইগুলোকে সর্বোত্তম দক্ষতা অর্জনে ও তাদের কর্মকান্ডের ব্যয় সাশ্রয়ে সাহায্য করবে। এর ফলে এমএফআইগুলোর ঋণ দানের হারের উপর কাঙ্ক্ষিত প্রভাবও লক্ষ্য করা যাবে। এমএফআই ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এমএফআইগুলোর সুদের হারকে তাদের জন্য প্রযোজ্য বিবেচনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিৎ, যেমন তাদের আয় ব্যয় ও ভারসাম্যের জন্য নমনীয় ঋণ পণ্য ও পরিষেবা গ্রহণে তাদের সীমাবদ্ধতা, আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চ লেনদেন ব্যয়, জটিল প্রক্রিয়া ও দুর্নীতি এবং জামানতের অভাব। এর ফলে ব্যাংক এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হার কাগজে-কলমে কম হলেও বাস্তবে তা ছোট ঋণগ্রহীতাদের জন্য কম নাও হতে পারে।

এজন্য ঋণগ্রহীতাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুদের হারের সাথে ক্ষুদ্রঋণের সুদের হারের তুলনার চেয়ে ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুযোগ ব্যয় তুলনা করা বেশি বাস্তবসম্মত। এমএফআইগুলোর সুদের হার অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতাদের সুদের হারের তুলনায় অনেক কম। বাস্তবে দেখা যায় যে এমএফআই এর সদস্য হওয়ার পর থেকে দরিদ্র পরিবারগুলোর অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণের মোট পরিমাণও হ্রাস পায়। গ্রামীণ ঋণ বাজারে অনানুষ্ঠানিক উৎসের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্ব থেকে দেখা যায় যে এমএফআইগুলো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা সত্যিকার অর্থে বাড়িয়ে তুলেনা।

প্রত্যয় : এ ব্যাপারে এমএফআইগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এমএফআইগুলোর দক্ষতা ও সঠিকভাবে কার্য পরিচালনার উপর এ খাতের সাফল্য নির্ভর করছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এমএফআইগুলোর সুদের হার পরিচালন ব্যয় পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে, তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে দক্ষ এমএফআইগুলোর ব্যয়ের ভিত্তিতে যাতে এই

ব্যয়গুলো মেটানোর মত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বিশেষত এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি এমএফআইগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা মূলধনের জন্য ঋণ তহবিলের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। দক্ষ এমএফআইগুলোর গড় ব্যয় অর্জনের জন্য এমএফআইগুলোকে ডিজিটাল ও অন্যান্য প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য এমআরএ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এমএফআইগুলোকে দক্ষতার উচ্চ স্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে দিতে পারে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের হারে ক্যাপ সেট করা তখনই বাঞ্ছনীয় হবে যদি বাজারে ব্যর্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় (যেমন ঋণগ্রহীতাদের কাছে তথ্যের অভাব ও এমএফআইগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি)। মূল বিষয় হলো এমএফআইগুলোর পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং এমএফআইগুলোকে তাদের পরিচালন দক্ষতার বিকাশ সহজ করার জন্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন প্রদান করা।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

ড. মোস্তফা. কে. মুজেরী : ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক শুমারি অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে পরিচালিত ৭৮ লক্ষ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৮৯ শতাংশ কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে মোট কর্মসংস্থানের ৫৬ শতাংশ বিদ্যমান। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বহুমাত্রিক আর্থিক ও অ-আর্থিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। তবে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচেছ মূলধন অর্থের অপর্যাপ্ত যোগান। সীমিত শাখা নেটওয়ার্ক, জামানতভিত্তিক ঋণ প্রদান অনুশীলন, ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণের তুলনায় মাঝারি ও বৃহৎ ঋণ প্রদানের প্রতি ঝোঁকের মত অনেক কারণে ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশে খুব একটা সহায়তা করতে পারে না। যদিও এমএফআইগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে তবে তাদের তহবিলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্রাথমিকভাবে নিজস্ব এবং অনানুষ্ঠানিক ঋণ দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। মূলধন বিনিয়োগের খুব অল্প অংশই ঋণ তহবিল থেকে গ্রহণ করে। দেখা যায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগের ৯০ শতাংশেরও বেশি স্ব-অর্থায়িত। ক্ষুদ্র উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এমএফআইগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের জন্য সঠিক মাধ্যম হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় এমএফআইগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার অর্থায়নে তিনটি বড় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় যেমন- পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (দক্ষতার সাথে পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভাব), আর্থিক সীমাবদ্ধতা (ঋণ তহবিলের সীমাবদ্ধতা ও উচ্চ ব্যয়), নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতা (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণের উপর এমআরএ-এর নিষেধাজ্ঞা)। এজন্য আর্থিক সীমাবদ্ধতা শিথিল করা প্রয়োজন যাতে এমএফআইগুলো অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

বাংলাদেশে এমএফআইগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যমে তাদের ঋণ কার্যক্রম অর্থায়ন করে। এমআরএ-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমএফআইগুলো সঞ্চয়, ঋণ মূলধন এবং ইক্যুইটি মূলধনসহ বিভিন্নভাবে মূলধন সংগ্রহ করার উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করে। এমএফআইগুলোর জন্য প্রতিবন্ধকতা হলো 'মূলধন ঘাটতির অবস্থা' থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ, বিশেষত গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়নের জন্য কার্যক্রম বাড়ানো যাতে গতিশীল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণির উদ্ভব হতে পারে।

বাস্তবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থ সরবরাহের জন্য এমএফআইগুলোর ঋণ কার্যক্রমের "আপ-স্ট্রিমিং" এবং ব্যাংকগুলির ঋণ কার্যক্রমের "ডাউন-স্ট্রিমিং" প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা আনুষ্ঠানিক ঋণ বাজারে অনেকটাই 'মিসিং এলিমেন্ট" হিসেবে বিদ্যমান যা ঋণের বাজারে "মার্কেট ফেইলিওর" হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এজন্য ক্ষুদ্রঋণ বাজারকে তার ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত করতে হবে, যাতে তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে আরও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের জন্য প্রণোদনা তৈরিতে নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য সহায়ক অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রামীণ আর্থিক বাজারে পৃথক বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় এমএফআইগুলোর প্রত্যাশিত ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য কি ধরনের বাস্তবসম্মত নীতি প্রয়োজন তার পর্যালোচনা দরকার। এজন্য ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ায় "কমিউনিটি ব্যাংক" বা " গ্রামীণ ব্যাংক" রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় উপায় হল ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা যা দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ যেমন: ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান এবং আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রয়েছে। এই সকল ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের সবগুলোই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান তা কিন্তু নয়; এর মধ্যে কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মালিকানার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে- ব্যক্তিগত ইক্যুইটি ও প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি। এইগুলো ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক হলেও বাস্তবে তাদের কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রত্যয় : সক্ষম এমএফআইগুলোকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তরের ব্যাপারে কি কি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন?

ড. মোস্তফা কে. মুজেরী : এমএফআইগুলোর কার্যক্রমে 'আপ-স্কেলিং', ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন, এমএফআইগুলোর সক্ষমতার বিকাশ এবং গ্রামীণ আর্থিক বাজারকে শক্তিশালী করার নীতি বিকল্প হিসেবে "বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আমি মনে করি, সক্ষম এবং সম্ভাবনাময় এমএফআইগুলোকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তরের পূর্বে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য এমএফআই সনাক্তকরণে মানদন্ড নির্ধারণ, মালিকানা ও শাসন কাঠামো, ব্যাংকগুলোর জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সামাজিক লক্ষ্য এবং দরিদ্র পরিবারের সামাজিক বিকাশকে সীমিত সংখ্যক এমএফআইকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তরিত করার যে বিরূপ প্রভাব তা থেকে রক্ষা করা যায় ইত্যাদি। ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক স্থাপন বা এমএফআইগুলোকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী ও একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। নির্দেশিকাগুলোতে মালিকানা থেকে শুরু করে পরিচালন ও পরিচালন পদ্ধতিসহ সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত এজেন্ডা হওয়া উচিৎ দক্ষতা বিকাশ ও আর্থিক বাজারে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি।■

বাংলাদেশে এমএফআইগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যমে তাদের ঋণ কার্যক্রম অর্থায়ন করে। এমএফআইগুলোর জন্য প্রতিবন্ধকতা হলো 'মূলধন ঘাটতির অবস্থা' থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ, বিশেষত গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়নের জন্য কার্যক্রম বাড়ানো যাতে গতিশীল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণির উদ্ভব হতে পারে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এমএফআই খাত ঝুঁকির মুখে পড়েছে

মো. আরিফুল হক চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট, আশা

বেসরকারি উন্নয়ন খাতের এক মেধাবী তরুণ নির্বাহী মো. আরিফুল হক চৌধুরী। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তিনি দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশার প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি আশা'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআর) সহ সংস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মো. আরিফুল হক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ (ম্যানেজমেন্ট) ও এমবিএ (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস) ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্রাথক্লাইড ইউনিভার্সিটি, স্কটল্যান্ড থেকে এমএসসি (ফিন্যান্স) ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

উল্লেখ্য, মো. আরিফুল হক চৌধুরী আশা'র প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মরহুম মো. সফিকুল হক চৌধুরী'র ছেলে।

বর্তমানে আশা'র সেবার আওতায় রয়েছে দেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষ। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও আশা'র কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে একটি প্রতিষ্ঠানের এমন সাফল্য প্রশংসনীয়। আশা'র মোট শাখার সংখ্যা ৩,০৭৩টি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৪,৯৯৯ জন। আশা'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭ লাখ এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৫৭ লাখ। সংস্থাটির মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৭০৫.১৫ কোটি টাকা এবং সদস্যদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৯,০৪৬ কোটি টাকা–যা ক্ষুদ্রঋণ খাতের একটি অনন্য কৃতিত্ব ও অর্জন। আশার এ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন আশার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সফিকুল হক চৌধুরী। এই সাফল্য অর্জনে তাঁকে যারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেন তাদের মধ্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও সে সময়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আরিফুল হক চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি যারা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে মো. সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধি থেকেই প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট 'আশা' প্রতিষ্ঠা করেন। আশা বর্তমানে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিদেশি দাতা সংস্থার সহায়তার বাইরে এসে তিনি আশাকে আত্মনির্ভর ও স্ব-অর্থায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। বিদেশি অনুদান ও সহায়তার ওপর নির্ভর না করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আশার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা একটি অনন্য নজির।

প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আশার তরুণ প্রেসিডেন্ট মো. আরিফুল হক চৌধুরী যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : আপনি দেশের এনজিও সেক্টরের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান আশা'র প্রেসিডেন্ট। এ দেশের অর্থনৈতিক

উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

আরিফুল হক চৌধুরী : আপনারা নিশ্চই স্বীকার করবেন, তৎকালীন পাকিস্তান আমল থেকেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ছিল দরিদ্র। সে সময় এ দেশের শতকরা প্রায় ৮০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। শিক্ষার হার ছিল ২০% এর নিচে। স্বাধীনতার পর দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি কিছু মানবদরদী ব্যক্তি ও সংগঠন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। শুরুতে এসব সংগঠন দরিদ্র ও হতদরিদ্র এবং ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজে অংশ নিলেও এক পর্যায়ে তারা উপলব্ধি করেন যে, দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন কর্মসংস্থান। এই কর্মসংস্থানের জন্যে প্রয়োজন অর্থ যা তাদের নেই। কিন্তু জামানত দেয়ার মতো সম্পদ না থাকায় ব্যাংক ও প্রচলিত ধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোনো ঋণ দেবে না। এই চিন্তা থেকেই ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্র্যাকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূচনা করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গ্রামীণ ব্যাংক। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু হয়। তাদের পথ ধরেই দেশে অনেক এনজিও/এমএফআই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের মূলধারার অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করেছে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এনজিও সেক্টরের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাদের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে বলেই দেশ আজ উন্নয়নের পথে হাঁটছে। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র অর্থায়নের দ্বারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। এতে আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এনজিও খাতের শতকরা ৯৫% সদস্যই নারী। গ্রামের এই নারীরা এখন অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতির ভিত টেকসই হচ্ছে।

এনজিও সেক্টরের এই উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের হার ২২% এ নেমে এসেছে এবং দেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আশা করা যায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে অচিরেই দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। আমি মনে করি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইগুলোর অবদান প্রধানত তিনটি কারণে উল্লেখযোগ্য– প্রথমত: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত: সাধারণ মানুষদেরকে অর্থনৈতিক সম্পৃক্তকরণ, তৃতীয়ত: সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন।

প্রত্যয় : আশা দেশের দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে– বলবেন কি?

আরিফুল হক চৌধুরী : আশা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আশা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বেসরকারি খাতের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় যা দেশের উচ্চ শিক্ষায় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আশা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যয়নরত ১৪৩ জন অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে পাঁচ বছর মেয়াদি শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে। এ খাতে আশার ব্যয় হবে ২.৩৫ কোটি টাকা।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০%। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

আরিফুল হক চৌধুরী : আমি আগেই বলেছি, এনজিও/এমএফআইসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশ ও দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকা প্রয়োজন। আপনারা জানেন, এ খাতের গ্রাহকদের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়মিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এর ফলে এমএফআইসমূহের পরিচালন ব্যয় ব্যাংকের চেয়ে অধিক। তদুপরি সরকারের নির্ধারিত সেবামূল্যেই দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও এনজিও/এমএফআইগুলো তাদের সার্ভিস চার্জ হ্রাস করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে ক্রমবর্ধমান খেলাপী ও কুঋণের ফলে ছোট বড় সব এনজিও/এমএফআই ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালন ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

আরিফুল হক চৌধুরী : এমএফআইসমূহকে তাদের প্রধান "পারফরমেন্স সূচক" (সদস্য সংখ্যা, ঋণ পোর্টফোলিও, PAR ইত্যাদি) এবং "গৃহীত সামাজিক কার্যক্রমের" মূল্যায়নের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি। এতে দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে।■

সক্ষমতা ও স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ এমএফআইদের

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া যায়

মুর্শেদ আলম সরকার
নির্বাহী পরিচালক, পপি ● চেয়ারম্যান, সিডিএফ

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মুর্শেদ আলম সরকার ষাটের দশকের শেষার্ধে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলাধীন জামালপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়িক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কে আলী সরকার এবং মাতার নাম আমেনা বেগম। মানবসেবার দৃঢ় প্রত্যয়ে মুর্শেদ আলম সরকার তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন কিছু উদ্যমী তরুণের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে এক ঝাঁক তরুণকে সাথে নিয়ে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে একটি উন্নয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। গোড়াপত্তন করেন পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) নামের সংগঠনটির। আজ সংস্থাটির কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে এবং অসংখ্য জনসাধারণের প্রাণের সংগঠন হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। মুর্শেদ আলম সরকার বর্তমানে সংস্থাটির কর্ণধার। তিনি জন্মলগ্ন থেকেই পপির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য উন্নয়ন সংস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের বৃহৎ নেটওয়ার্ক ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) এর চেয়ারম্যান। এছাড়াও তিনি উন্নয়ন সংস্থা 'এসএসএস' এর সভাপতি, অনুকূল ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও দুর্যোগে সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক 'নাহাব' এর সম্পাদক। মুর্শেদ আলম সরকার দেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর যুক্তরাজ্যে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রভূত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

দেশোন্নয়নের অন্যতম সংগঠক সিডিএফ এর চেয়ারম্যান ও পপি'র নির্বাহী পরিচালক মুর্শেদ আলম সরকার প্রত্যয়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি সিডিএফ এর চেয়ারম্যান এবং পপি'র নির্বাহী পরিচালক। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে মনে করেন?

মুর্শেদ আলম সরকার : বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংঘঠন ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান নিশ্চিত করেছে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে বিবিধ কর্মসূচির প্রয়োগ ও জনসম্পৃক্ত উদ্যোগের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী অনন্য উদাহরণ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। উন্নয়ন সংস্থাসমূহ জনগণের সামর্থ্য সৃষ্টিতে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম ও সৃষ্টিশীল জনসম্পদে রূপান্তরিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। দেশের ক্রমাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অগ্রভাগে নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিশ্চিত করতে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার বহুবিধ প্রচেষ্টা বেসরকারি সংস্থাসমূহ অব্যাহত রেখেছে। নারীর অব্যাহত উন্নয়নের "বাংলাদেশ মডেল" আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, পরিবেশ উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওদের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের যে কোন ভাল উদ্যোগের সাথে এনজিওসমূহ সর্বদা সহযোগিতা করে আসছে।

বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা বা ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে ঘূর্ণায়মান ঋণ সুবিধা প্রদান করতে শুরু করে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীভুক্ত কোন ব্যক্তির ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহযোগিতা প্রাপ্তি কার্যত অসম্ভব ছিল। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী "ঋণ গ্রহণে উপযোগী নয়" বলে সাব্যস্ত হতো। কিন্তু বেসরকারি সংস্থা বা ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে। ছোট ছোট প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে দেশের ঋণ সংস্কৃতির খোলনলচে বদলে ফেলে। এমনকি সহায় সম্বলহীন জীর্ণ কুটিরে বসবাসরত নারীরাও ক্ষুদ্রঋণের আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে তারা নুতনভাবে বাঁচার প্রেরণা পায়। আজ লাখো বঞ্চিত নারী স্বমহিমায় সীমাহীন দারিদ্র্য দশা থেকে মুক্তি পেয়ে সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অমিত সাহস ও সেবার ব্রত নিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়নে যাত্রা শুরু করে এবং ক্রমশ "ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা" হিসেবে অবস্থান সুদৃঢ় করে। অবশেষে সংস্থাগুলো সরকারের স্বীকৃতি অর্জন করে এবং মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থাসমূহ সমগ্র বাংলাদেশে ৩ কোটি ৫০ লক্ষেরও অধিক পরিবারের সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশাল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে এবং এ সেক্টর জিডিপিতে ১৪% এর বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করতো তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে এ সেক্টর সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

প্রত্যয় : শুরু থেকেই বাংলাদেশ ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। দেশের এনজিও/এমএফআই খাত দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কতোটা সফল হয়েছে–আপনার মূল্যায়ন কি? এ ব্যাপারে আর কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

মুর্শেদ আলম সরকার : পাকিস্তানের শোষণ আর অপশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন মানচিত্রের জন্ম নেয়াটা যে কত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ফসল তা আমরা সবাই অবগত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ দারিদ্র্য পীড়িত থাকা অস্বাভাবিক নয়। এনজিও/ এমএফআইসমূহ সরকারের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে নানা ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের ভাগোন্নয়নে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। যারা এতদিন কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ধর্ণা দিতো অন্যের দ্বারে দ্বারে তারা এখন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তারা এখন অন্য অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করে তুলেছে এনজিও/ এমএফআইরা। যে নারীরা স্বামীর উপার্জনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন তারা এখন নিজেরাই উপার্জনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভুমিকা পালন করছে। তারা এখন গৃহস্থালি ও সামাজিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। যুবক-যুবতীরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে কিংবা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশব্যাপী অগণিত যুবক-যুবতীর পথচলার সাথী হয়েছে এমএফআইসমূহ।

সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যদি এমএফআই-সমূহকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে সরকারের যে কোন কর্মসূচি অতি দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এর প্রকৃত সুফল পাবে অগণিত সাধারণ মানুষ। আমি মনে করি এনজিও/এমএফআইসমূহকে সরকার বর্ধিত সহযোগিতা ও প্রাপ্য স্বীকৃতি যথাযথভাবে প্রদান করলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নে সংস্থাগুলো বর্ধিষ্ণু অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র

অনেকে বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেই এমএফআইসমূহের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রমের সমালোচনা করে থাকে। এমনকি এমএফআইসমূহ চড়া সুদ নিচ্ছে বলেও তারা বিভিন্ন টকশো বা প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে। বর্তমানে সরকারিভাবে ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ (২৪% ক্রম হ্রাসমান) এর বেশি কোন এমএফআই এর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমআরএ প্রতিনিয়ত মনিটরিং ও সুপারভিশনের মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। এমএফআইসমূহ ব্যাংক ও সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সপ্তাহে বা মাসে গ্রাহকের কাছে যাবার প্রয়োজন হয় না। বরং গ্রাহকরা ঋণ ফেরতের কিস্তি নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের শাখায় আসে।

১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন, এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

মুর্শেদ আলম সরকার : ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধাবঞ্চিত জনগণের স্বার্থে কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন ঋণীকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক গ্যারান্টির ব্যবস্থা রাখে

যেমন- বন্ধক, জামানত, জামিনদার ও সম্পত্তির দলিলাদি ইত্যাদি। এমনকি সময়মত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁদে পড়তে হয়। উপরন্তু অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে পিডিআর এ্যাক্ট এর আওতায় মামলা রুজু করে বকেয়া ঋণ আদায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু এমএফআইরা যে ঋণ প্রদান করে সেখানে কোন প্রকার জামানত/বন্ধক/সম্পত্তির দলিল-পত্র রাখা হয় না। বরং অত্যন্ত সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা হয়। সময়মত ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হলে গ্রাহককে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুদ/সার্ভিস চার্জ দিতে হয় না। তাই গ্রাহকরা এমএফআই থেকে ঋণ গ্রহণে বেশি আগ্রহী হয়।

অনেকে বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেই এমএফআইসমূহের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রমের সমালোচনা করে থাকে। এমনকি এমএফআইসমূহ চড়া সুদ নিচ্ছে বলেও তারা বিভিন্ন টকশো বা প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে। বর্তমানে সরকারিভাবে ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ (২৪% ক্রম হ্রাসমান) এর বেশি কোন এমএফআই এর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এমআরএ প্রতিনিয়ত মনিটরিং ও সুপারভিশনের মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। এমএফআইসমূহ ব্যাংক ও সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সপ্তাহে বা মাসে গ্রাহকের কাছে যাবার প্রয়োজন হয় না। বরং গ্রাহকরা ঋণ ফেরতের কিস্তি নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের শাখায় আসে। কিন্তু এমএফআই এর গ্রাহকরা তা করে না। কারণ তাতে তাদের এমএফআই এর শাখায় আসা-যাওয়ার অনেক খরচ হয়। যা তাদের জন্য বোঝাস্বরূপ। তাই এমএফআই এর কর্মী-কর্মকর্তারা গ্রাহকের বাড়ি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকে। তাই এমএফআইদের খরচ অনেক বেশি হয়। পুঁজির খরচ ও পরিচালনা ব্যয় প্রায় ২২.৫০% দাঁড়িয়ে যায়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে গ্রাহকদের নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ/সুদ নেয়া হয় ২৪%। অর্থাৎ ১.৫০% মার্জিন থেকে অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বকেয়া থেকে যায় যার একটি বড় অংশ কোন দিন আদায় হয় না। যেমন করোনার কারণে ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণের বিশাল অংশ বকেয়া পড়েছে এবং পড়ছে। দিনে দিনে ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ঋণ মওকুফ করা হয়। এমতাবস্থায় অবাস্তব বা প্রকৃত অবস্থা না জানার দরুণ কোন কোন মহল সার্ভিস চার্জ বা সুদের হার কমানোর কথা বলছেন। এমএফআইদের এ বাস্তবতায় যদি সার্ভিস চার্জ/সুদের হার কমানো হয় তাহলে দেখা যাবে ৪/৫ টি এমএফআই ছাড়া বাকিগুলো টিকে থাকার সক্ষমতা হারাবে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন ইন্ডাস্ট্রিতে ধ্বস নেমে আসবে এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক বেকারত্বের অভিশাপে নিপতিত হবে। তাছাড়া এমএফআইসমূহে কর্মরত লক্ষ-লক্ষ কর্মী ও কর্মকর্তা বেকারত্ব বরণ করবে।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

মুর্শেদ আলম সরকার : প্রায় প্রতিটি এমএফআই অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমএফআই প্রায় ব্যাংকের মতই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবেও সুনাম কুড়িয়েছে। এমএফআইসমূহ যে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে তা ব্যাংকের চেয়েও অধিক কার্যকরী ও সৃজনশীল। যার ফলে এমএফআই এর আদায় হার ৯৮% থেকে ৯৯.৫% পর্যন্ত স্থিতিশীল। যেখানে ব্যাংকের আদায় হার তুলনামূলকভাবে বেশ কম।

যেহেতু ক্ষুদ্র অর্থায়নে এমএফআইগুলো স্বচ্ছতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, সেহেতু সক্ষমতা ও স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে কিছু সংখ্যক এমএফআইকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দিয়ে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। আশা করি সরকার অচিরেই এ ব্যাপারে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হবে।■

উৎপাদন ও নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ

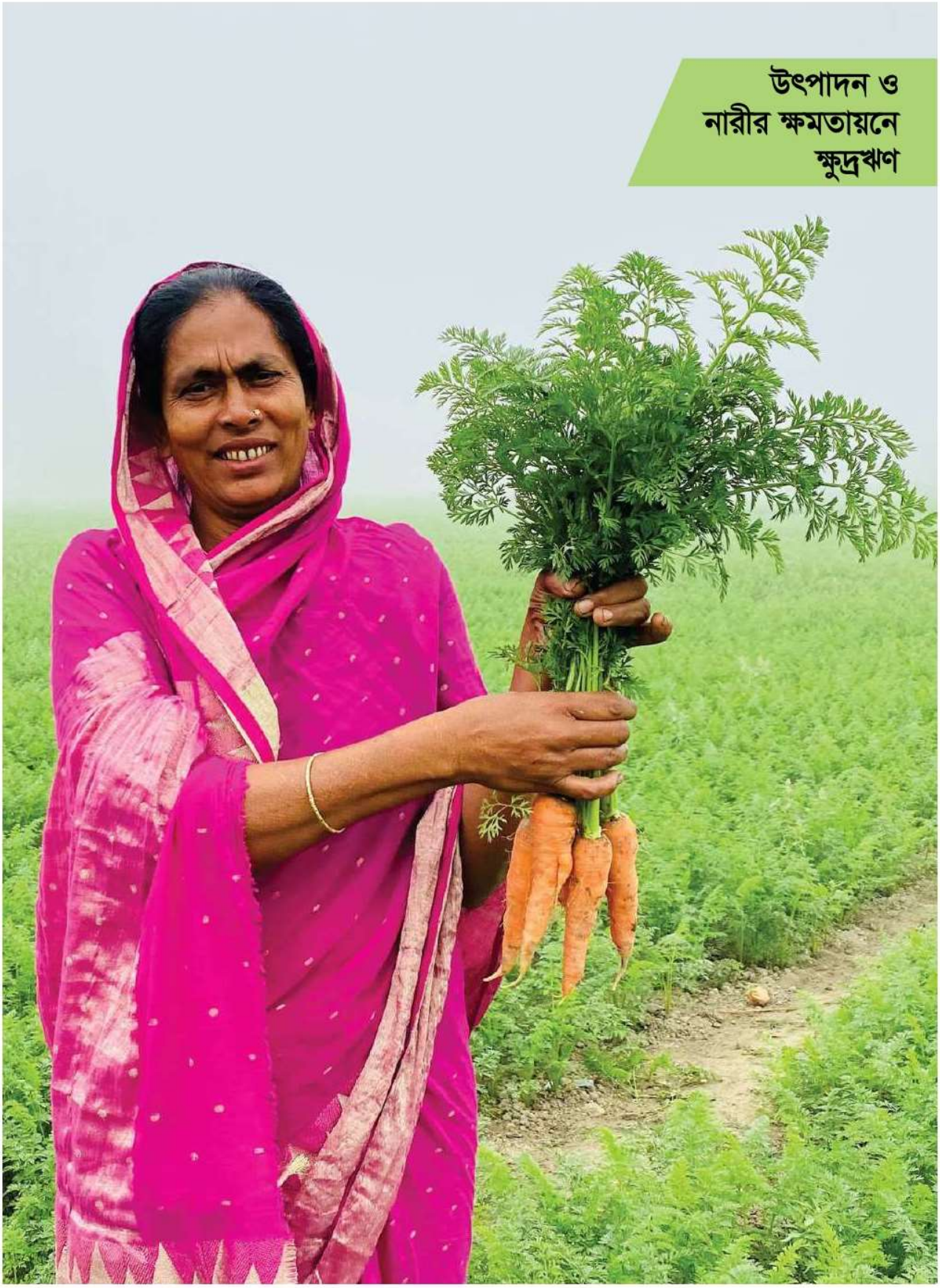

যোগ্য এমএফআইদের ব্যাংক হিসেবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ দেয়া উচিৎ

সাজ্জাদ জহির
নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ

দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ERG) এর নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। তিনি BIDS এর সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। এই কৃতি অধ্যাপক ১৯৬৬-৯৯ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য, ১৯৯৮-২০০০ সালে বাংলাদেশ ইকোনমিক এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি BBS এর অনেক টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্যানেল অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য, রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশনের (২০০৭-০৯) সদস্য, ২০০৮-১৪ পর্যন্ত BKGET এর ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সাজ্জাদ জহির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে গ্র্যাজুয়েশন করেন এবং কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটি থেকে ডিস্টিংশনসহ পিএইচডি লাভ করেন। ড. জহির পৃথিবীর অনেক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় কাজ করেছেন। তিনি World Bank, IFC, DFID, IFAD, UN-ESCAP, SCD, UNICEF, FAO, WFP, UNDESA এবং IFPRI এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থায় কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রচুর লেখা দেশ-বিদেশের জার্নালে ও দেশের দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যয় এর সাথে সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সাজ্জাদ জহির যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ERG) এর নির্বাহী পরিচালক। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সাজ্জাদ জহির : একথা ঠিক যে, সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা যা এক সময় পারেনি, এসব ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিস্তৃত সাংগঠনিক অবকাঠামো, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও

অসহায় নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও সুশৃঙ্খল হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের ঋণ চাহিদা পূরণ করছে।

তবে একথা ঠিক, এই ঋণ প্রাপ্তি এককভাবে দারিদ্র্য বিমোচনকে নিশ্চিত করে না। আর পাঁচটা ঋণের মতো ঋণ গ্রহীতার বৈশিষ্ট্য, বাজারের অনিশ্চয়তাও ঝুঁকির উপর ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারিতা নির্ভর করে। অবশ্য এটি নিশ্চিত যে, ঋণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলেই কেবল তার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি আনার সুযোগ তৈরি হয়। যে সকল ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তা হিসেবে সফলতার সাথে এই পথ পেরুতে পেরেছেন এবং এখনও পারছেন, তাদের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও সার্বিক অর্থে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারায় এনজিও/এমএফআই সেক্টরের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক।

এমএফআই বিষয়ক আলোচনার মধ্যে প্রায়শই ঋণ ও সুদের হারকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা অনেক সময় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন উপেক্ষা করি। ঋণ প্রদান কর্মে সৃষ্ট সংগঠন সেসবের অন্যতম এবং সেইসাথে যে সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে উঠেছে তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমাজকে এগুতে সহায়তা করেছে। সেইসাথে এনজিও/এমএফআই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অথবা চাকুরিতে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে নারীর যে সচেতায়ন (ক্ষমতায়ন) ঘটেছে তা বাংলাদেশকে নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের অন্যান্য শক্তিশালী দেশ থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রেখেছে। সমাজ উন্নয়নে এসবের সার্বিক ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন, এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

সাজ্জাদ জহির : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তৃতি ঘটায় এবং সেইসাথে মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক সেবা সম্প্রসারিত হওয়ায় বাজারে (একই ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণের ক্ষেত্রে) সুদের হার নিম্নমুখী হবার সম্ভাবনা বেশি। এই নতুন বাস্তবতায়, ঋণ গ্রহীতাদের সাথে এমএফআই কর্মীদের যোগাযোগের ধরণে গুণগত পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে খরচ কমিয়ে এনে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা প্রয়োজন। তবে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে যে টেকসই ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন এবং সে কারণে বাজারকে কিছু ছাড় দিতে হতে পারে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থেই এনজিও/এমএফআইসমূহকে

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন। কারণ, তারা শুধু মুনাফাকেন্দ্রিক নয়, তারা সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নে তাদের ভূমিকা অনেক। আর এটি বাস্তব যে গ্রাহকদের কাছে যাওয়া, ঋণ পৌঁছে দেয়া এবং তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় এমএফআইসমূহের লোকবল বেশি প্রয়োজন হয় এবং পরিচালন ব্যয়ও বেশি। সে ক্ষেত্রে সকল দিক বিবেচনা করে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করতে হবে। কারণ এমএফআই সমূহ সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই কার্যক্রম ব্যহত হবে।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

সাজ্জাদ জহির : ব্যাংকসমূহের দশ টাকা জামানত নিয়ে (হয়তো) পঞ্চাশ টাকা ঋণ দেয়ার এখতিয়ার আছে। এমএফআইগুলো সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অবহেলার কারণে এবং এই খাতের একতা সুদৃঢ় না থাকায় যে ঐতিহাসিক লগ্নে কোনো কোনো এমএফআইকে ব্যাংকে রূপান্তর করা জরুরি ছিল, আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, পূর্বের যৌক্তিকতা কি এখনও আছে? এটা সত্য যে কৃষিতে যন্ত্রাদির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ সংগঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে পুরনো ধাঁচের স্বল্পমাত্রার ঋণের চাহিদা কমতে পারে। তবে স্থানীয় প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠনকে শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সহযোগী বাণিজ্যিক সংগঠনের অস্তিত্ব জরুরি, যারা একদিকে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান জোগাবে এবং বাণিজ্যিক লাভের অংশবিশেষ নিজেদের স্বার্থে স্থানীয় কর্মকান্ডে ব্যয় করবে। সে কারণেই, অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংকের অনুমোদন বিবেচনা করা এবং ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা এমএফআইদের মধ্যেকার যোগ্যদের সেই পথে সম্পৃক্ত করার সুযোগ দেয়া উচিৎ।■

দেশের উন্নয়নে মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক প্রয়োজন

আবদুল আউয়াল
নির্বাহী পরিচালক
ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF)

এনজিও সেক্টরের অন্যতম নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) এর নির্বাহী পরিচালক মো. আবদুল আউয়াল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ১৯৮০ সালে সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এ ব্যাংকের মাইক্রোক্রেডিট অ্যান্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে এ ব্যাংকের সহকারি মহাব্যবস্থাপক পদ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে ২০০৪ সালে তিনি সিডিএফ এর পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৯ সালে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগে জনাব আবদুল আউয়াল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে (PKSF) মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বিশেষজ্ঞ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আবদুল আউয়াল সিডিএফ এর পক্ষে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে এমএফআইসমূহ, সরকারি-বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংক, ডোনার এজেন্সি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ফেডারেশন (FNB) এবং বিদেশিদের মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন SEEP নেটওয়ার্ক, BWTP, INAFI, SAMN প্রভৃতির সাথে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালন করেন।

তিনি ইউকে, নাইরোবি, কেনিয়া, ইউএসএ ও ভারতসহ মাইক্রোক্রেডিট বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি দিল্লী, নিউইয়র্ক, মেক্সিকো, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, আবুধাবি, বেইজিং, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া ও চীনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিষয়ক অ্যানুয়াল মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন।

প্রত্যয় : আপনি সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে মনে করেন?

আবদুল আউয়াল : বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে উভয় ধরনের বক্তব্যই রয়েছে। তবে পিকেএসএফ এর একটি প্রতিষ্ঠানের ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স এর রিসার্চে দেখা গেছে জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১৪%। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানের প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয়কে দিয়ে আমরাও একটা স্টাডি করিয়েছি। তারাও গবেষণা করে দেখেছে এর পরিমাণ ১৪.৫% থেকে ১৫%। আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে এনজিও/এমএফআই সদস্যের ৯০%-ই নারী। নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ যে বেশ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এর পেছনে এ খাতের ভূমিকাই বেশি। এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো ৩ কোটিরও বেশি নারী সদস্যকে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মোদ্যোগী করে তুলেছে। শুধু আর্থিকই নয়, তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, বাল্য বিবাহ রোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করার কাজও তারা পরিচালনা করছে। এমনকি বর্তমান করোনা মহামারীতেও এই খাত তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে।

বর্তমানে এখাতে ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের সরকার দারিদ্র্য নিরসন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গরিব মানুষকে সঞ্চয়ী করার জন্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে, আমরাও সরকারের এসব কার্যক্রমকে সফল করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করি। হাওর, বাওর,

পাবর্ত্য ও পাহাড়িয়া অঞ্চল সবখানেই– যেখানে যাওয়া কঠিন সেখানে আমরা কাজ করছি। ফলে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা ও অবদান স্বীকৃত সত্য। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় এটি উঠে এসেছে যে, এমএফআই এবং এনজিও খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রত্যয় : বর্তমানে দেশে দেশে টেকসই উন্নয়নের কথা বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। এ দেশের টেকসই উন্নয়নে এনজিও/এমএফআই সেক্টরের ভূমিকা কতোটা?

আবদুল আউয়াল : দেখুন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতেও ছিল খুবই অনুন্নত। বর্তমান সরকার এবং আমাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সমবেত প্রচেষ্টায় দেশের আর্থ সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তবে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি হলেও তা এখনো শতভাগ অর্জিত হয়নি। অবশ্য নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন একবার বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

আমাদের সংস্থাগুলো শুধু ক্ষুদ্র ঋণই বিতরণ করে না, স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে, শিক্ষা, পরিবেশ, জন্ম নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে সচেতন করছে। ফলে, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের সদস্যরাও যে পরিমাণ সচেতন, ভারতে ও নেপালে তা দেখা যায় না।

প্রত্যয় : সিডিএফ এর প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে ১৯৯২ সালের ২৫ অক্টোবর দেশের এনজিও ও এমএফআই খাতের যে অবস্থা ছিল এখন তার আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। এ মুহূর্তে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো বিন্যাসের প্রয়োজন আছে কি? আপনার বক্তব্য জানতে চাচ্ছি।

আবদুল আউয়াল : আপনি ঠিকই বলেছেন। এক সময় ক্ষুদ্র অর্থায়নের উপকারভোগী সদস্যদের ঋণের পরিমাণ ছিল ৫শ' থেকে এক হাজার টাকা। যুগের পরিবর্তন ও সদস্যের সক্ষমতার ফলে এখন সেই ঋণ ২০/৫০ হাজার টাকা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকাও হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ থেকে যারা নিজেদের ব্যবসায়িক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন প্রতিবছরই তাদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ব্যবসাও বাড়ছে। এখন তারা SME ঋণ নিচ্ছে। আমি মনে করি এ সেক্টরে মাইক্রোক্রেডিট থেকে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজে উন্নীত হবার হারটা বেশি।

আরেকটি বিষয় সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে যে সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা যদি আরো বাড়ানো যায় তাহলে আমরা দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো। নোবেলজয়ী শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এক সময় বাংলাদেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। দারিদ্র্য জাদুঘরে ঠাঁই পাবে। আমি এটা বিশ্বাস করি। সরকার এবং বেসরকারি খাত যদি সমন্বিতভাবে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে কাজ করে তাহলে এটা সম্ভব।

প্রত্যয় : দেশের এনজিও/এমএফআই দারিদ্র্য নিরসনসহ বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজসহ জনসচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রেখে আসছে। আপনার মতে, এই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো আর কোন কোন সেবার মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে পারে?

আবদুল আউয়াল : এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন চালু করতে হবে সদস্যদের জন্যে। যিনি এ খাতের সদস্য ঋণগ্রহীতা তাকে জানতে হবে তিনি আমাদের কতো পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ দিচ্ছেন, সংস্থা তার কাছ থেকে বেশি নিয়ে নিচ্ছে কি না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এখন আমাদের টেকনোলজির দিকে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেক সংস্থা যারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে তাদের ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনে যেতে হবে যাতে মাঠ কর্মীরা প্রতিদিন গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, প্রতি সপ্তাহে উঠান বৈঠক করতে পারে। এখন সদস্যদের প্রচুর সময় দিতে হয়, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হলে ডিভাইস এবং মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে খুব কম সময়ে যোগাযোগ স্থাপন, পরামর্শ এবং কিস্তি আদায় সম্ভব হবে। কর্মীদের মাঠ পর্যায়ে বার বার যাবার প্রয়োজন হবে না। গ্রাহকরাও এ পদ্ধতিতে ডিজিটাল সিস্টেমের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে ক্যাশ ইন-ক্যাশ আউট সিস্টেমে যদি ঋণ বিতরণ করা যায় তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাপক গতি আসবে। বাংলাদেশ মাইক্রোক্রেডিট সেক্টরের বয়স এখন ৪০ অর্থাৎ দুর্দান্ত যৌবন বয়স। যদিও ১৯৭৪ সাল থেকে ব্র্যাক কাজ শুরু করেছে তবে ১৯৮০ সাল থেকে এই খাত বিকশিত হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে ধরলে ৪০ বছরই হয়। আমাদের এখন গ্র্যাজুয়েশনের দিকে যেতে হবে। আমি আগেই বলেছি, একমাত্র মাইক্রোক্রেডিটই 'হাঙ্গার পোভার্টি' দূর করতে পারে। সেক্ষ এমপ্লয়মেন্ট করতে পারে। এটাকে গ্র্যাজুয়ালি করে যদি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজে নেয়া যায় তাহলে এটি জিডিপিতে প্রতিফলিত হবে। শুধু পারিবারিক শ্রম নয়, বাইরের শ্রমও দিতে পারবে। একটা এন্টারপ্রাইজ চালাতে বেশ ক'জন লোকের প্রয়োজন হয়। এতে এসব এন্টারপ্রাইজে ১০/২০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রত্যয় : মাইক্রোএন্টারপ্রাইজে যেতে এনজিওদের কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি?

আবদুল আউয়াল : এ খাতের টপ ফাইভ এর কোনো সমস্যা নেই। বড় ৫টি এনজিওর অনেক ফান্ড আছে তাদের হয়তো সমস্যা নেই, কিন্তু অন্য যারা মাঝারি ও ছোট তারা তারল্য সঙ্কটে ভুগছে। আপনারা জানেন পিকেএসএফ সরকারের গঠিত হোলসেল ল্যান্ডিং এজেন্সি– এটা একটা সোর্স অব ফান্ড। কিন্তু এটি ৭৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দিতে পারে না। সংস্থাটি ২২০-২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে রিচ করছে আরো ৫০০ প্রতিষ্ঠান এর বাইরে থাকছে। সে জন্য CDF Bank-NGO লিংকেজ বাস্তবায়নে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও এটাকে সহযোগিতা করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গ্রামে টাকার যে সার্কুলেশন তা বাড়াতে হবে।

প্রত্যয় : অনেকেই মনে করেন এমএফআই/এনজিও খাতে ঋণের সুদ অনেক বেশি। আপনার বক্তব্য কি?

আবদুল আউয়াল : আমি এক সময় সোনালী ব্যাংকে চাকরি করতাম। আমারও মনে হতো এনজিওরা বেশি সুদ দেয়। কিন্তু যখন এই সেক্টরে কাজ করতে আসলাম তখন অনেক কিছুই বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারলাম। এ খাতে দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে এখানে জবাবদিহিতা আছে, দ্বিতীয়ত ঋণ পরিশোধের মানসিকতা। সোনালী ব্যাংকে থাকার সময় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে একটা কাজে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে এডিবির রিপোর্ট ছিল– বাংলাদেশে গরিব ঋণ গ্রহীতারা ধনী ঋণ গ্রহীতাদের চেয়ে ভালো গ্রাহক। আবার গরিবদের মধ্যে নারীরা ঋণ গ্রহীতা হিসেবে ভালো। আমাদের এ সব সংস্থার শতকরা ৯৫ জনই মহিলা। এ জন্যে এখাতে রিকভারি রেট অনেক ভালো। এই করোনা মহামারী মুহূর্তে যতোদিন লকডাউন থাকে তখন আদায় হার কমে কিন্তু লকডাউন না থাকলে রিকভারি রেট বাড়ে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান

ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

আবদুল আউয়াল : আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তখন আমি সোনালী ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। গ্রামীণ ব্যাংকের একটা সাবসিডিয়ারি ছিল– গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন। এটা ছিল রংপুরবেজড। সোনালী ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাদের ১০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিল। গ্রামীণ ব্যাংকে মাঝে মাঝে তাদের গ্রুপগুলো দেখাতে নিয়ে যেতো আমাদের। আমি তাদের কাছে গিয়ে আন্তরিক হয়ে বললাম, এনজিওরা তো আপনাদের কাছ থেকে বেশি সুদ নেয়। তারা বললো– এটা ঠিক যে তারা বেশি সুদ নেয় কিন্তু এর বিকল্প কি? এনজিওরা আমাদের বাড়িতে এসে ঋণ প্রদান করে, ব্রাঞ্চে যেতে হয় না। আমি আমার সঞ্চয় বাড়ি থেকে দিতে পারি। আমার কেউ অসুস্থ হলে তারা কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো– সেই পরামর্শও দেয়, আবার অনেক সময় ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ এনজিওরা একই সাথে অনেক ধরনের সেবা প্রদান করে। এই সেবামূল্যও কিন্তু কম নয়। তারা আরো বললো, সার্ভিস চার্জ সমস্যা না, আমাদের প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ এবং তা সময়মতো পাওয়া। তখন এমএফআই হয়নি, আমরা বলতাম যাতে এনজিওরা সুদের হার ৩০% এর উপর না নেন। ফিলিপাইনে এ কার্যক্রমের সুদের হার হচ্ছে ৬০%, ল্যাটিন আমেরিকায় ৭০% থেকে ৮০%, মেক্সিকো বলিভিয়াতেও সুদের হার ৭০% এর উপরে।

এমনকি ভারতেও এই ঋণের সুদ আমাদের চেয়ে বেশি। একটা ধারণা আছে যে, গ্রামীণ ব্যাংক বেশি সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে কিন্তু তাদের সার্ভিস চার্জ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। যারা এই সেক্টরের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন তারা উপলব্ধি করেছেন যে ব্যাংক থেকে এ খাতের উচ্চ সুদহার যথেষ্ট যৌক্তিক। ডোনাররাও বিষয়টি বুঝতে পারেন। যারা এ খাতের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার ভেতরে প্রবেশ করেননি তারাই এমন মন্তব্য করেন।

আমি মনে করি, এনজিও/এমএফআইসমূহের অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ পরিচালনা ব্যয়ের ব্যাপারে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে যদি সুদ হার আরো কমানো হয় তবে অনেক সংস্থার পক্ষেই টিকে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বিবেচনায় আনার অনুরোধ করছি।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

আবদুল আউয়াল : আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এমআরএ গঠন মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম যে কমিটি তা ছিল মাইক্রোক্রেডিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (MRI)। সেটাই পরে করা হয়েছে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA)। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সে সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, সদস্যদের মধ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রথম প্রথম যোগদানও করতেন। সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বর্তমান পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ মান্নান ছিলেন। এমআরএ'র প্রথম যে ২টি প্রস্তাব ছিল তা হলো মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট এবং মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক। পরে জেনেছি এই মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংকের প্রস্তাবটি বাদ দেয়া হয়েছে।

ঐ কমিটিতে যে সকল বোদ্ধা ব্যক্তিত্বগণ ছিলেন তারা চিন্তা করেছিলেন, এক সময় ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং মাঝারি ও বড় অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। এ জন্যেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ব্যাংক হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের ফান্ডের অভাব নেই। ঋণের চেয়ে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। তাদের বিদেশের টাকাও প্রয়োজন নেই। এখন ধরুন, আশার ৩ হাজার শাখা। সবগুলোতে প্রয়োজন নেই। তাদের ১৫০/২৫০ শাখার সঞ্চয়ে মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক করা যেতেই পারে।

আশা এবং ব্র্যাক বিদেশেও কাজ করছে। গ্রামীণ ব্যাংক আমেরিকায় কাজ করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের আমেরিকান শাখাগুলো এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল হয়ে গেছে। অনেক বাধা-বিপত্তি সমস্যা সত্ত্বেও ঢাকা শহরে মেট্রোরেল হচ্ছে, পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, আমাদের স্বপ্নগুলো একে একে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে দেশে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা প্রদানের আওতায় নিয়ে আসার জন্যে সক্ষম এমএফআইদের মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে শীর্ষ পর্যায়ের এমএফআইসমূহকে আলাদা আলাদা অথবা সমন্বিতভাবে একটি মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ছাড়া এমআরএ'র আইন-কানুনও কিছু সংস্কার করা দরকার। সরকার গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধির কথা বলছে, সেখানে এমআরএ'র রেগুলেশনে বাধা রয়েছে। এসব সংস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বেশি টাকা তারা জমাতে পারবে না। আমি মনে করি এগুলো বিবেচনায় এনে এমএফআই সমূহকে অধিক সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। একটি শাখায় হয়তো ৮০% সঞ্চয় হয়ে গেছে এখন যদি একজন গ্রাহক এসে ১০/২০ হাজার টাকা জমা দিতে চান তখন তাকে কিভাবে ফিরিয়ে দেবেন? সে তো এই টাকা নিয়ে বিপদেও পড়তে পারে। আমি মনে করি এই নিয়মের পরিবর্তন প্রয়োজন।■

অনেক এমএফআই আছে যারা মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী
অনারারী অ্যাডভাইজার
ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM)

এনজিও সেক্টরের মেধাবী ও উদ্যমী ব্যক্তিত্ব জনাব সাব্বির আহমেদ চৌধুরী Institute for Inclusive Finance and Development (InM) এর অনারারী অ্যাডভাইজার। এর আগে ২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি আইএনএম-এর পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ী সাব্বির আহমেদ চৌধুরী বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাক এর আন্তর্জাতিক কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে ২০১২ এর জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্র্যাক এর ট্রেনিং ডিভিশন ও মাইক্রোফাইন্যান্স-এরও পরিচালক ছিলেন। অভিজ্ঞ ও কর্মনিষ্ঠ সাব্বির আহমেদ চৌধুরী কর্মসুবাদে দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, হাইতি, ইন্ডিয়া, মরক্কো, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, জিম্বাবুয়ে, নেপাল, সৌদি আরবসহ অনেক দেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) কনসালটেন্ট হিসেবে নিবন্ধিত।

সিলেটের এই কৃতি সন্তানের জন্ম ১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে। তার পিতা আব্দুস সালাম চৌধুরী ও মাতা হাবিবুন্নেছা খাতুন। ক্ষুদ্র অর্থায়নের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সাব্বির আহমেদ চৌধুরী ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ ১৯৭৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি নেদারল্যান্ডস এর Institue of Social Studies (ISS), Hague থেকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দেশ-বিদেশে অসংখ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রত্যয় : আপনি দেশের একজন খ্যাতনামা উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব। আপনার দৃষ্টিতে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও এবং এমএফআইসমূহ কতোটা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে?

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী : গত চার দশকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ দেশ তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও মানবসম্পদ সূচকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, জিডিপি'র আকার ছিল ৭৫৭৫ কোটি টাকা, একই সময়ে মাথাপিছু আয় মাত্র ১২৯ মার্কিন ডলার এবং দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০%। পঞ্চাশ বছর পর দেখা যাচ্ছে রপ্তানি আয় বহুগুণ বেড়ে মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘরে। জিডিপির আকার এখন ২০১৯-২০ এ দাঁড়িয়েছে ২৭ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা যা ১৯৭৩-৭৪ থেকে ৩৬৯ গুণ বেশি। দারিদ্র্যের হার কমে হয়েছে ২০.৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় হয়েছে ২২৭৪ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে আমরা যদি মানবসম্পদ উন্নয়ন দেখি যেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২২২.৪ জন সেখানে ২০১৯ সালে এসে দাঁড়ায় হাজারে ৩০.৮ জন। ১৯৯১ সালে মাতৃ মৃত্যুর হার ছিল ৪.৭৫ শতাংশ সেটি এখন ১.৬৯ শতাংশ।

গত পাঁচ দশক থেকে ধারাবাহিকভাবে রপ্তানি আয়-রেমিটেন্স বেড়েছে, কৃষি শিল্পের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বেড়েছে, অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের উপরে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক তথ্যের সাথে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পান না, তাদের কাছে বাংলাদেশের উন্নয়ন একটি ধাঁধাঁ বা পাজল। সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেটি এনজিও নামে পরিচিত। এই উন্নয়নের পেছনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে মূলত বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কাজ করতে আরম্ভ করে। দেশকে গড়ে তোলার প্রেরণায় অনেক শিক্ষিত যুবক যুবতী এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, ধ্বংসলীলা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। দেশ গড়ার কাজে এই সব এনজিও'র আবির্ভাব হয়, সেখানে বেশির ভাগ ছিলেন তরুণ সমাজ, তারা এসব এনজিওতে কাজ করতে আরম্ভ করেন দেশ গড়ার উদ্দীপনায়। প্রাথমিকভাবে এসব সংস্থা প্রথমে রিলিফ কর্মযজ্ঞ, শিক্ষা (বয়স্ক শিক্ষা), স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং এসব কাজে সম্পৃক্ত করা। সময়ের সাথে সাথে তাদের কার্যক্রমের পরিধির ব্যাপ্তি বাড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে খুব কমই দরিদ্র খানা পাওয়া যাবে যারা কোনো না কোনো এনজিওর সদস্য না। প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি উপজেলায় তাদের উপস্থিতি। অর্থনীতিবিদদের ধারণা এই এনজিও কার্যক্রমই বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকঠি।

NGO-MFI (Non Government Organization, Microfinance Institution) এই MFI নামটি সম্পৃক্ত হয় যখন এনজিওরা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালিত করে এবং Microcredit Regulatary Authority (MRA) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সর্বোপরি ২০১৫ সালের InM এর এক গবেষণা থেকে জানা যায়, Microfinance বাংলাদেশের GDP-তে ৮.৯ থেকে ১১ শতাংশ– এই Range এর মধ্যে অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সেক্টরের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রত্যয় : দেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে এনজিও খাতের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী : পূর্বেই বলেছি ১৯৭২ সাল থেকে এনজিওরা বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। পর্যায়ক্রমে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বয়স্ক ব্যবহারিক শিক্ষা এবং বর্তমানে শিশু শিক্ষা বা Non Formal Primary Education (NFPE)। ব্র্যাকের NFPE কার্যক্রমকে বলা হয় বেসরকারি খাতে পৃথিবীর বৃহত্তম শিশু শিক্ষা। স্যার ফজলে হাসান আবেদ আমাদের এক সভায় আলোচনা করছিলেন ব্র্যাকের Non Formal Primary Education নিয়ে। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা যদি এই শিক্ষা কার্যক্রম আরো ১০ বছর পূর্বে আরম্ভ করতে পারতাম তা হলে বাংলাদেশকে উন্নয়নের আরো অনেক উপরে নেয়া যেত। ব্র্যাকে NFPE কার্যক্রম ১৯৮৫ সালে আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ রোধ, নারীদের সচেতনতা, ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি উন্নয়নের মূল গতিধারায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র শিক্ষা কার্যক্রমের অবদানে।

আমার মতে এই কার্যক্রমের ফলে ব্যাপকতা বাড়বে, দেশ থেকে নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য বৈষম্য কমবে এবং এক শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জের হার একসময় ৩২% ছিল। পরে ৩০% ও ২৭% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বশেষ এই হার ২৪% করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এমএফআই/এনজিওদের পরিচালন ব্যয় ২২.৫০% পড়ে যায়। অর্থাৎ মার্জিন থাকে মাত্র ১.৫০%। এর মধ্যে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি হয় কিংবা নানা যৌক্তিক কারণে ঋণ মওকুফও করতে হয়। তারপরও কোনো কোনো মহল সার্ভিস চার্জের এই হার আরো কমানোর কথা বলছেন।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন, এতে দু'চারটি বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, আপনার মূল্যায়ন কি?

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী : একটা কথা বলে রাখা ভাল যে মাইক্রোফাইন্যান্স হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ যা গ্রাম থেকে প্রতি সপ্তাহ কিংবা দু'সপ্তাহ পর পর আদায় করা হয়, সে জন্য মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের পরিচালনা (Operating) খরচ অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশে এমআরএ'র লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোট এমএফআই এর সংখ্যা প্রায় ৭৪৬টি। এর মধ্যে প্রায় ৫০টি বড় ও মধ্যম এমএফআই। বাকি ৬৯৬টি ছোট।

ছোট এমএফআইদের সৌন্দর্য হল এরা সংগঠনের সদস্যের খুবই কাছাকাছি থাকে এবং এলাকায় সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে কাজ করে থাকে। এখানে সংগঠনের সদস্য এবং এমএফআই কর্মী সবাই খুবই পরিচিত। আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা খুবই বেশি। এসব এমএফআইরা অনেক সুন্দর সুন্দর এবং Innovative কার্যক্রম গ্রহণ করে। এলাকায় এদের সুনাম খুবই বেশি।

বর্তমানে এমএফআইদের সার্ভিস চার্জ ২৪%। যেহেতু এসব এমএফআইদের লোন পোর্টফোলিও খুবই কম সে কারণে এদের রিটার্ন ও আয় কম। ২৪% সার্ভিস চার্জ আদায় চালানো তাদের জন্য কষ্টকর। এখন যদি সার্ভিস চার্জ বাড়ানো হয় তবে এসব অনেক এমএফআই বন্ধ হবার উপক্রম হবে। অনেকে হয়তো অন্যান্য বড় এমএফআইদের সাথে Merge হয়ে যাবে অথবা অন্যের কাছে তাদের Portfolio বিক্রি করে দিবে অথবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে। সেক্ষেত্রে যে সমস্যা হবে তা হলো, এক বিরাট জনগোষ্ঠী তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটবে। সার্ভিস চার্জ কমানোর যারা চিন্তা করেন তারা বড় বড় এমএফআই দেখে এ সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আরো ব্যাপক আলোচনা ও একটা গবেষণা করা দরকার।

প্রত্যয় : দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিচ্ছে। ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকার ফলে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী : MRA প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে বিশেষজ্ঞগণ দুটি Proposal দিয়েছিলেন। একটি Regulation for Microfinance Institution এবং অন্যটি ছিল Regulation for Microfinance Bank. কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে Microfinance Bank বাদ দিয়ে শুধু MFI এর Regulation তৈরি করা হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক MFI আছে যারা Microfinance Bank হিসাবে রূপান্তর হতে পারে, তাদের সে যোগ্যতা তারা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে।

বাংলাদেশকে আরো উন্নয়নের শিখরে তুলতে গেলে ব্যাপকভাবে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজে ঋণ বিতরণের বিকল্প নেই। এই উদ্যোক্তারা প্রস্তুত এবং Microfinance Bank এর মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করলে এরাই হবে দেশের engine of growth.

এ প্রেক্ষিতে আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ ও এমএফআইদের যৌথ উদ্যোগ নেয়া দরকার, তা হলেই বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। এ কাজে CDF-কে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে আমি মনে করি। CDF Microfinance Bank এর প্রথম Draft regulation-টা খুঁজে বের করে একটা খসড়া Draft তৈরি করে এমএফআইদের সাথে যোগাযোগ এর মাধ্যমে তাদের মতামত, পরিবর্তন-পরিমার্জন করে পরবর্তী পর্যায়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সাথে আলাপ করতে পারে।

সরকারি পর্যায়ে ড্রাফট উপস্থাপনা করতে একজন অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য উপস্থাপককে এ দায়িত্ব দিতে হবে। আমার মতে অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে এ দায়িত্ব অর্পন করা যেতে পারে।■

মাইক্রোসেভ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত
সংক্ষিপ্ত শিক্ষণীয় প্রতিবেদন # ৮

গ্রামীণ-২ মডেলের অসাধারণ সাফল্য

গ্রাহাম এ এন রাইট • ডেভিড ক্র্যাকনেল • স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড

ভাষান্তর: **বিদ্যুত খোশনবীশ**

[সহযোগিতায়: এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-অর্থ, বুরো বাংলাদেশ]

প্রচলিত যে পদ্ধতিতে গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সেবা দিয়ে আসছিলো তার তুলনায় গ্রামীণ-২ মডেলকে দ্বিধাহীনভাবে একটি বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উপলব্ধি ও চাহিদার ধরন নিরূপন করার পাশাপাশি প্রচলিত সেই আর্থিক সেবা পদ্ধতিকে নমনীয় করতে বহু বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি যে মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছে গ্রামীণ-২ মডেল তারই ফসল। গ্রামীণ ব্যাংক এবং সেই সাথে গ্রামীণ ব্যাংককে অনুসরণকারী এনজিও- এমএফআই এর সাফল্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শুধুমাত্র এক বছরে পরিশোধযোগ্য ঋণ দিয়েই খুব ভালোভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের অন্যতম একটি মুখ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব, যাকে মৌলিক ঋণ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে দরিদ্র মানুষের চাহিদা বহুমুখী ও ব্যাপক এবং দিন দিন সেই চাহিদাগুলো বিকশিত হচ্ছে। একই সাথে ঋণ প্রদান করেই যে তাদের সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয় সে ধারণাও ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এই বাস্তবতায় নতুন নতুন আর্থিক সেবাখাত উদ্ভাবন ও তা সরবরাহ করে গ্রামীণ-২ মডেল প্রমাণ করেছে, এই সব আর্থিক সেবাগুলোর চাহিদা এদেশের আর্থিক বাজারে রয়েছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক সেই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। আর এভাবেই গ্রামীণ-২ মডেলের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক আগের চেয়ে আরো বেশি বাজারমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে।

ফলাফল অসাধারণ। অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও প্রদানকৃত ঋণ আদায়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো কঠিন সময় পার করার পরেও গ্রামীণ ব্যাংক হারানো গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে এবং প্রদানকৃত ঋণ থেকে লভ্যাংশ অর্জনে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২৫ লক্ষ সদস্য তৈরি করতে গ্রামীণ ব্যাংকের ২৭ বছর লেগেছিলো কিন্তু গ্রামীণ-২ মডেলের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের মতো তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রামীণ ব্যাংক মাসে ১ লক্ষ

MicroSave

৪০ হাজার এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে বছরে ১৭ লক্ষ নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করার সক্ষমতা দেখিয়েছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক আমানত বেড়েছে ৩ গুণ এবং ঋণস্থিতি বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। একই সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক এক দিকে একটি রক্ষণশীল ঋণক্ষয় সঞ্চিতি নীতি প্রবর্তন করে এবং অপর দিকে ঝুঁকিপূর্ণ গৃহঋণ পোর্টফোলিওর জন্য একটি সহজ ঋণক্ষয় সঞ্চিতি নীতি গড়ে তোলে। এই সময়টাতেও ব্যাংকটির ঋণ পোর্টফোলিওর গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ঋণক্ষয় সঞ্চিতির পরিমাণ অনেক বেশি হলেও ২০০১ সালের মুনাফা ৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০৪ সালে এসে দাঁড়ায় ৪৪ কোটি টাকায়। অন্যদিকে ঝরে পরা গ্রাহকরাও আবার ফিরতে শুরু করে এবং এমনকি একটি বিপুল সংখ্যক খেলাপী গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করে নিয়মিত সদস্য হিসেবে পুনরায় সেবা নিতে আরম্ভ করে। ফলে বলা যায়, বাজারমুখী গ্রামীণ-২ মডেল যেভাবে ফসল ঘরে তুলেছে তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।

রাদারফোর্ডসহ অন্যান্যদের গবেষণা থেকে জানা যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকরা তাদের জীবনের বৈচিত্রপূর্ণ চাহিদা মেটাতে এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় গ্রামীণ-২ মডেলের বিভিন্ন আর্থিক সেবা নানা উপায়ে ব্যবহার করছে। পাশ বই ভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব ব্যবস্থার প্রচলন এবং চুক্তিভিত্তিক কিংবা মেয়াদী সঞ্চয় সেবা ব্যাংকটির গ্রাহকদের 'উর্ধ্বমুখী' ও 'নিম্নমুখী' অর্থাৎ বহুমুখী সঞ্চয় গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে সংসারের জটিল আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে সহজীকরণের একটি অনবদ্য পদ্ধতি গ্রাহকগণ পেয়েছে। আর পর্যাপ্ত বা ঘাটতিপূরণ ঋণ ব্যবস্থা চালু করার কারণে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের পক্ষে ব্যবসায় পুঁজির জোগান ধরে রাখাও সম্ভব হয়েছে। একই সাথে এ ধরনের ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকায় গ্রাহকরা আকস্মিক ঝুঁকি মোকাবেলা কিংবা বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের উপায় খুঁজে পেয়েছে। এইভাবে ঘাটতিপূরণ ঋণ গ্রহণ করে গ্রাহকরা প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মূল ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করার সুযোগও গ্রহণ করতে পারছেন। গ্রামীন ব্যাংক আর্থিক সেবা সরবরাহের মাধ্যমে যে গ্রাহকদের বেশির ভাগ চাহিদা পূরণ করছে সে গ্রাহকরা অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতের উপর খুব কমই নির্ভরশীল হয়েছে। এই বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও আছে। এক কথায় বলা যায়, গ্রামীণ-২ মডেল দেখিয়ে দিয়েছে যে আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়েছে, চমকপ্রদভাবে গ্রাহকদের কাছে সেগুলোর উপযোগিতা বা গ্রহণযোগ্যতা ততো বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশ এর কথা বলা যায়। প্রতিষ্ঠানটি বহু বছর ধরে গ্রাহকদের প্রদত্ত ঋণসেবার মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করেছিলো যাতে গ্রাহকরা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও সঞ্চয় সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োজনীয় ঋণ ও সঞ্চয় সেবা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। গ্রাহকরাও এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলো। গ্রামীণ ব্যাংকের ঝরে পরা সদস্যদের ফিরিয়ে আনতে ও খেলাপী গ্রাহকদের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে সেবাপণ্যের ঐ বর্ধিত উপযোগিতাই প্রকৃত অর্থে প্রেরণা যুগিয়েছে। বাজার চাহিদামুখী আর্থিক সেবা যোগান দেবার সামর্থ্য অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ। অনুমান করা অযৌক্তি হবে না, আর্থিক সেবার বর্ধিত উপযোগিতা ও দরিদ্র মানুষের অপ্রতুল সম্পদ ব্যবস্থাপনার যৌথ প্রভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হবে। অর্থাৎ এর সারকথা হলো, গ্রামীণ-২ মডেল বাজার চাহিদার দিকে যথাযথ সাড়া দিতে সক্ষম হওয়ায় বাজার থেকেও যথেষ্ট ইতিবাচক সাড়া এই মডেল পেয়েছে। গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই ব্যবসা পদ্ধতির এই পরিবর্তন থেকে বিপুলভাবে লাভবান হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও 'প্রচলিত গ্রামীণ মডেল' অনুসরণ করছে তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে আর্থিক সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়নসাধন, সম্মুখ সারির কর্মী তৈরি করা এবং ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা গড়ে তোলা। তাছাড়া বিশ্বের যে অঞ্চলগুলোতে প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয় সেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেবে সেখানকার নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে সনদ প্রাপ্তির বিষয়টিও তাদের জন্য একই সাথে আরো একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। তবে প্রচলিত গ্রামীণ মডেলের জন্য

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি দেখা দেবে ঠিক তখন, যখন পূর্ব নির্ধারিত সুদ হারে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সাধারণ পদ্ধতি অর্থাৎ 'প্লেইন ভ্যানিলা' পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে ঐ মডেল অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আরো বেশি বাজারমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার পথে অগ্রসর হবে। কারণ ব্যাংকটির প্রচলিত এই মডেলে তুলনামূলকভাবে গ্রাহকদের জন্য খুব বেশি প্রকারের সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি জড়িত, অন্ততপক্ষে বাজার গবেষণা ও আর্থিক সেবার মান উন্নয়নের জন্য। আর সঞ্চয় সেবা প্রবর্তনের জন্য এই পরিবর্তন হতে হবে অনেক ব্যাপক। মার্গারেট রবিনসন ও গ্রাহাম এ এন রাইটের ভাষায়, 'মানুষের কাছ থেকে স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে গেলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিবর্তন

ঘটবে; ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ তদারকি, তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও মৌলিক পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে।' রাদারফোর্ডের গবেষণা থেকে দেখা যায়, গ্রাহক ও সম্মুখ সারির কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্কেও অপরিহার্যভাবে পরিবর্তন ঘটতে থাকবে।

অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্রামীণ-২ মডেলের বাস্তবায়ন শুরু হলে এই পদ্ধতি অনিবার্যভাবে প্রচলিত গ্রামীণ মডেলের তুলনায় এটিকে একটি উন্নততর ও বহুমাত্রিক সংস্করণ হিসেবে তুলে ধরবে, কারণ পৃথিবীর যে সব দেশ ও অঞ্চলে গ্রামীণ মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে সেখানকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদা সরাসরি আর্থিক সেবা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। গ্রামীণ-২ মডেলের বাজার কৌশলের তুলনামূলক বেশি চ্যালেঞ্জিং অংশগুলো এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়তো রয়েছে কিন্তু গ্রুপ গ্যারান্টি কিংবা যৌথ দায়বদ্ধতার শর্ত প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্রামীণ মডেল অনুসরণকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের মৌলিক পরিচালনা নীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। গ্রামীণ মডেল অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বড় অংশ বেশ মাত্রাতিরিক্তভাবেই এই যৌথ দায়বদ্ধতার শর্ত প্রয়োগ করছে। যার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় গ্রামীণ মডেল অনুসরণকারী আফ্রিকান প্রতিষ্ঠানগুলোতে। সাপ্তাহিক মিটিং-এ তারা কিস্তির টাকা আদায় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মিটিং সমাপ্ত ঘোষণা করে না। ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ৩-৪টি ঋণ সাইকেল পার করার পর গ্রুপ গ্যারান্টির শর্তটি ক্রমান্বয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে নিয়মিত কিস্তি আদায় নিশ্চিত করতে গ্রাহকদের জন্য অব্যাহতভাবে নানা ধরনের আর্থিক সেবা চালু রাখা মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। অবশ্য এর যৌক্তিকতাও আছে। আর্থিক সেবা যত বেশি মান সম্পন্ন হবে, যত বেশি গ্রাহক চাহিদামুখী হবে, গ্রাহক ততো বেশি সময় মতো কিস্তি পরিশোধ করবে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিপুল সংখ্যক খেলাপী ও ঝরে পরা গ্রাহকদে বেলায় এর সত্যতা ফুটে উঠেছে। কারণ দেখা গেছে, গ্রামীণ-২ মডেলের নতুন নতুন বাজারমুখী আর্থিক সেবা গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ব্যাংকটির ঝরে পরা সদস্যরা পুনরায় ফিরে এসেছে এবং দীর্ঘ দিনের খেলাপী গ্রাহকরাও তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে খুব সহজেই বলে দেয়া যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত চমকপ্রদ সময় অপেক্ষা করছে। তবে একই সাথে ফলপ্রসূ আর্থিক সেবার প্রকল্পগুলো নিয়ে এগিয়ে চলার পথে ব্যাংকটির কিছু প্রচলিত ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। কারণ বর্তমানে একজন গ্রাহকের জন্য কোন সেবাটি বেশি উপযোগী হবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্র ব্যবস্থাপকরা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। এরকম ঘটার কারণ হলো, কেন্দ্র ব্যবস্থাপকরা গ্রাহকদের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার সুযোগ পান। তবে ধীরে ধীরে হলেও সেবা সম্পর্কীত তথ্য বা জ্ঞান হাতের নাগালে চলে আসতে থাকায় সেবা বাছাইয়ের উপর গ্রাহকদের নিয়ন্ত্রণ অতীতের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কেন্দ্র ব্যবস্থাপকদের এমন 'শিক্ষকসুলভ' ভূমিকার বিবর্তন ঘটবে এবং তারা এক সময় শুধুমাত্র তথ্য ও পরামর্শ প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাহক নিজেই তার জন্য উপযুক্ত সেবাটি বাছাই করে নেবেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায় থেকে সুদৃঢ় সেবা প্রত্যাশি গ্রাহকদের জন্য সেবা সম্পর্কিত জ্ঞান উন্মুক্ত করে দিলে এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারলে পর্যায়ক্রমে সেবা সরবরাহ ব্যবস্থাতেও তার অর্থবহ প্রভাব পড়বে। যদি সেবার বৈশিষ্ট্যতে গ্রাহকবান্ধব নমনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করা থাকে তবে তার বাস্তবায়ন জটিল হওয়ার কথা নয়। আসল কথা হলো, আর্থিক সেবার বৈশিষ্ট্যই এর ভেতরকার সমস্যা সহজে চিহ্নিত করার উপায় বাতলে দেয়, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের সেবার গুণগত মানেরও উন্নয়ন ঘটে। গ্রাহকদের নিকট আর্থিক সেবা পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন। রাদারফোর্ড বলেছেন, 'তথ্য প্রযুক্তির সুফল এখনও উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।'

সর্বোপরী, ১২% হারে আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকবে। তবে প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে নিজস্ব ঋণসেবা পদ্ধতির মধ্য দিয়েই বিদ্যমান গ্রাহক (গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক সেবা নিয়ে যে সদস্যরা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পেরেছে তাদেরসহ) এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্পের কারণে আকৃষ্ট হয়ে সদস্য হওয়া তুলনামূলকভাবে সচ্ছল গ্রাহক শ্রেণির মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংককে এই বিনিয়োগ করতে হবে।

আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত এই জন্য, গ্রামীণ ব্যাংক অন্যতম অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান যারা আর্থিক বাজারে যথার্থই শক্তিশালী ও বৃহৎ আকারে অবদান রেখে চলেছে।■

● অনুবাদক: নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্ব

এম. মুকিতুল ইসলাম

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশের মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কাজে অবকাঠামো তথা ঘরবাড়ি, রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ, স্কুল প্রভৃতি মেরামত করার প্রয়োজনে অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছিল। মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ দেশি বিদেশি সংস্থার অংশগ্রহণে অবকাঠামো উন্নয়নে এক নবধারার সূচনা হয়েছিল। দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক, গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ অনেক স্থানীয় এনজিও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে অঞ্চলভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সহায়তা করেছিল। কেয়ার এদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীণ রাস্তা ও কালভার্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা তৈরি ও মেরামতে কেয়ার বাংলাদেশের আরএমপি নামক কর্মসূচি আমাদের দেশের গ্রামীণ রাস্তাগুলোকে তৈরি করে স্থানীয় হাট-বাজারের সাথে গ্রোথ সেন্টার হিসেবে সচল রেখে স্থানীয় চলাচল ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে সহায়তা করেছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ অধিকাংশ রাস্তা-ঘাট পাকা করে তা টেকসই করার চেষ্টা করেছে। হাওর, নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাঁধ এবং রাস্তা উন্নয়নে উপকূল অঞ্চলে সরকারের সাথে স্থানীয় এনজিও কাজ করেছে। এদেশে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে কারিতাসের ভূমিকা বর্ণনাতীত।

> বুরো বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এ কেন্দ্রগুলো ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি অনেক সংস্থার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই অবকাঠামোর জন্য দেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যাংক যারা বুরো'র ঋণের অর্থের যোগানদাতা তারাও আস্থার সাথে বুরো বাংলাদেশকে নিরন্তর ঋণের যোগান দিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৭০-৮০%। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে দরিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন ছিল অপরিহার্য। ব্র্যাক প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানা ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজনে তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করার ক্ষেত্রে দেশে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন দক্ষতা উন্নয়ন আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অনেক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এলাকাভিত্তিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে এর মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। স্থানীয় পর্যায়ের নির্মিত এ অবকাঠামো সংস্থার প্রতি সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

নব্বই দশকে যাত্রা শুরু করা বুরো বাংলাদেশ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। দেশব্যাপী সংস্থাটির ব্যপ্তি ছড়িয়ে। প্রতিটি জেলায় ঋণদান কর্মসূচির সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি ও রেমিটেন্স সেবা বাস্তবায়নে ১১৩০টি শাখা, ২২০টি এরিয়া, ২৮টি আঞ্চলিক ও ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এর অধিকাংশই ভাড়া বাড়িতে। ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত অফিসগুলোর জন্য প্রতিমাসে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অর্থ ব্যয় শুধু সমস্যাই নয়, মাঝে মাঝে বাড়ির মালিক কর্তৃক সংস্থাকে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। বুরো বাংলাদেশের শুরুতেই লক্ষ্য ছিল স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয় করে সেখানে নিজস্ব স্থাপনা নির্মাণ করে ব্যয় সাশ্রয় ও টেকসই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

সংস্থা শাখার জন্য নির্মিত অনেক ভবনে নিজস্ব অফিস স্থাপন ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠানকেও ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে যা সংস্থার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে এলাকার সাধারণ মানুষ ও সদস্যদের মাঝে ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংস্থার প্রতি সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

যেকোনো সংস্থার অবকাঠামো সেই সংস্থার স্থায়িত্বের দিক-নির্দেশক। ঋণ সেক্টরে টিকে থাকতে গেলে পুঁজির যোগানদাতাকে তার ক্লায়েন্টের উপর আস্থার প্রয়োজন হয়, সেদিক দিয়ে এই সেক্টরে ঋণদানের জন্য অবকাঠামো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

দেশে বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব পূরণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও ব্যবহার করছে। বুরো বাংলাদেশ টাঙ্গাইল, মধুপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, খুলনা, ফরিদপুর, বগুড়া ও রংপুরে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নামে বহুতল অবকাঠামো নির্মাণ করে তা নিজেরা ব্যবহার করার পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সকল স্থাপনায় আবাসন সুবিধাসহ রয়েছে কয়েকটি করে প্রশিক্ষণ কক্ষ, বড় বড় হলরুম, ক্যাফেটেরিয়া, রেস্তোরাঁ এবং জিমসহ আধুনিক সুবিধাদি।

বুরো বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এ কেন্দ্রগুলো ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি অনেক সংস্থার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই অবকাঠামোর জন্য দেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যাংক যারা বুরো'র ঋণের অর্থের যোগানদাতা তারাও আস্থার সাথে বুরো বাংলাদেশকে নিরন্তর ঋণের যোগান দিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বুরো বাংলাদেশ যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, সাভার, পাবনা ও রাজশাহীতেও এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। এ অবকাঠামোগুলোতে বুরোর সকল পর্যায়ের কর্মীসহ সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য এদেশে একমাত্র ব্র্যাক এর 'লার্নিং সেন্টার' নামক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশের অনেক জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে। সারা বছর এ কেন্দ্রগুলো তাদের নিজস্ব কর্মী ও সদস্যদের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকে। যদিও কদাচিৎ অন্য প্রতিষ্ঠান তা ব্যবহারের সুযোগ পায়। দেশের এনজিওদের এ ধরনের অবকাঠামো ব্যবহারের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলার প্রেক্ষিতে বুরো বাংলাদেশ এসকল স্থাপনা নির্মাণ করে নিজস্ব ব্যবহারের পাশাপাশি তাদের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা ক্ষুদ্র ঋণ সেক্টরে একটি বড় নিয়ামক হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যেকোনো সংস্থার অবকাঠামো সেই সংস্থার স্থায়িত্বের দিক-নির্দেশক। ঋণ সেক্টরে টিকে থাকতে গেলে পুঁজির যোগানদাতাকে তার ক্লায়েন্টের উপর আস্থার প্রয়োজন হয়, সেদিক দিয়ে এই সেক্টরে ঋণদানের জন্য অবকাঠামো একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। অন্যদিকে ঋণ ব্যবহারকারী অর্থাৎ সদস্যদের আস্থা অর্জনও জরুরি। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন সদস্যদের মাঝে ঋণ সেবা দিয়ে থাকে তেমনি তাদের কাছ থেকে আমানত বা সঞ্চয়ও জমা নিয়ে থাকে। এদেশে সঞ্চয় আত্মসাৎ-এর মত দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। যদি কোনো সংস্থার অঞ্চলভিত্তিক বড় ধরনের অবকাঠামো থাকে তাহলে সদস্যগণ নির্ভয়ে সে প্রতিষ্ঠানে তাদের আমানত জমা রাখতে পারে। বুরো বাংলাদেশ এ দুটি ক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ হিসেবে ব্যাংক ও সদস্যদের মাঝে দৃঢ় আস্থা নিয়ে বিরাজমান।■

● প্রধান, অবকাঠামো উন্নয়ন
বুরো বাংলাদেশ

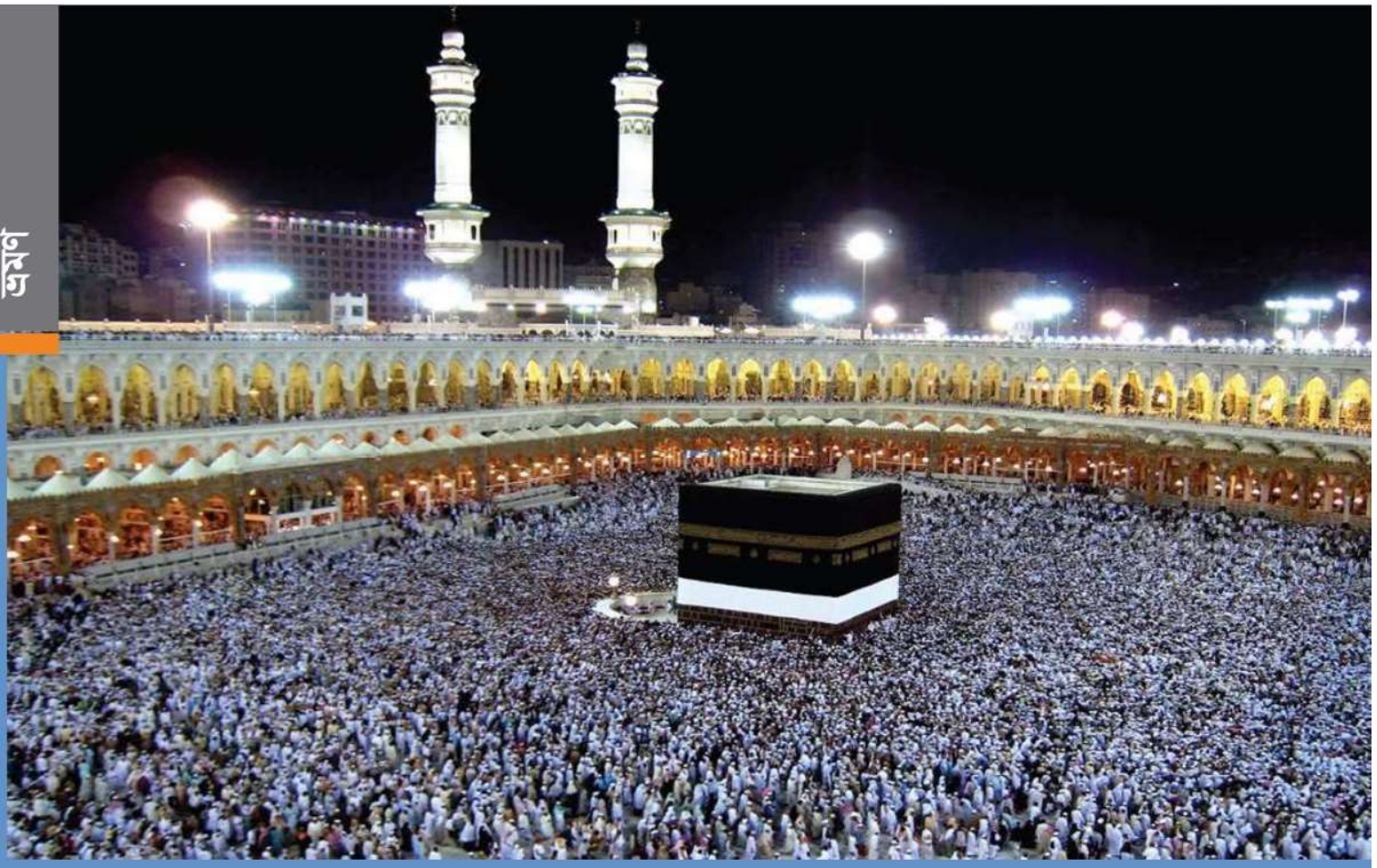

মাকে নিয়ে হজ্ব এবং একটি বিস্ময়কর ঘটনাঃ পর্ব-১

আরিফ আজম সিন্টু

২০০৪ এর ৭ জানুয়ারি। সন্ধ্যা ৭টা, ঢাকা বিমান বন্দর। চেক-ইন সেরে বোর্ডিং পাস নিয়ে আমার মাকে নিয়ে সুপরিসর বোয়িং ৭০৭ এর ভিতরে ঢুকলাম এবং যথারীতি সিটে বসলাম অন্যান্য হাজী সাহেবদের সাথে। ঠিক ১৫ মিনিট পরে সন্ধ্যা ৭টা ১৫-তে প্লেনটা আকাশে উড়লো এবং শুরু হলো মাকে নিয়ে আমার দীর্ঘ ৪০ দিনের হজ্ব সফর। সিডিউল মত ৬ ঘণ্টা আকাশ ভ্রমণ শেষে রাত ১টায় জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। ভ্রমণের পুরো সময়টায় মনিটরে একটু পরপরই দেখাচ্ছিলো বিমানটা এখন কোথায়, কোন দেশের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এবং কত মাইল বেগে যাচ্ছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক রুটে বিমানগুলো আকাশে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায়, নির্দিষ্ট গতিবেগে চলে। এক্ষেত্রে ৩০০ থেকে ৩৫০ সিটের বোয়িং ৭০৭ গড়ে ঘণ্টায় ৫শ' মাইল বেগে চলে। এই বিমানগুলো ঢাকা থেকে জেদ্দা যেতে ৩ হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয় ৬ ঘন্টায়। আমাদের বিমানটি বাংলাদেশ সময় রাত ১টা এবং স্থানীয় সময় রাত ১০টায় জেদ্দা বিমান বন্দরে ল্যান্ড করলো।

বিমান থেকে নেমে বাসে করে টার্মিনালে পৌছলাম। জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সৌদি আরবের অন্যতম বৃহৎ বিমান বন্দর, ঢাকা বিমান বন্দরের তুলনায় কমপক্ষে ২/৩ গুণ বড় হবে এবং ঠিক আরব সাগরের পাশেই অবস্থিত। বিশাল টার্মিনাল কিন্তু ঢুকেই অবাক হলাম কারণ ভিতরটা একেবারেই ফাঁকা। এমনকি কাউন্টারগুলোও ফাঁকা। ঠিক ৩ ঘন্টা পর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে অবশেষে কাউন্টারে হাজির হলেন এক সৌদি যুবক এবং ঘটাং ঘটাং পাসপোর্টে সীল মেরে বাংলাদেশি হাজীদের ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সে একটু বেশিই সময় নিলো কারণ ৩৫০ বাংলাদেশি হাজীদের মধ্যে আমি ছিলাম একটু স্বতন্ত্র বেশে। সাদা একরাশ কেশ ছাড়া পাশ্চাত্য পোশাকে এই আজব এক ভদ্রলোককে দেখে অবকাই হলেন তিনি। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাথে বয়স্কা মহিলাটি কে? আমার মার বয়স তখন কমপক্ষে ৭৬ হবে। আমি উত্তর দিলাম, উম্মী অর্থাৎ আমার মা। আমার মুখে আরবী শব্দ শুনে উনি খুশি হলেন এবং মাকে নিয়ে হজ্ব করতে এসেছি শুনে ইংরেজিতে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের দু'জনের পাসপোর্টেই ঘটাং করে সীল মেরে দিলেন। ঢুকলাম ভিতরের রিসেপশনে এবং শুরু হলো আরো ৪ ঘণ্টার

অপেক্ষা। ভোর ৫টায় আমাদের মালপত্র উঠলো সৌদি মুয়াল্লীর নির্দিষ্ট বাসে এবং রওনা হলাম পবিত্র শহর মদিনার উদ্দেশ্যে। নিয়ম অনুয়ায়ী হজ্বের ১০ দিন আগ পর্যন্ত যারা জেদ্দা পৌছেন, তাদের সরাসরি মক্কায় না নিয়ে আগে ৮ দিনের জন্য মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়। আজ থেকে ১৮ বছর আগের কথা, জানি না এ নিয়মটা এখানো চালু আছে কিনা।

যাই হোক, জেদ্দা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে যখন মদীনায় পৌছলাম তখন সকাল ১০টা। পথে দুই বার বাস থামলো। প্রথমবার ফজর নামাজের জন্য ছোট এক শহরের মসজিদের সামনে এবং দ্বিতীয়বার মদীনা শহরে ঢোকার মুখে বিনামূল্যে সকালের নাস্তার প্যাকেট দেয়ার জন্য। নাস্তার প্যাকেটে সাধারণত বড় বড় ২/৩টা খেজুর এবং আমাদের দেশের বানরুটির মত পাউরুটি এবং পানির বোতল ছিলো। তারপর যথারীরিত বাস ছাড়লো এবং ৫ ঘন্টা বাস ভ্রমণ শেষে মদীনার সরকারি (ব্যালটি) হাজীদের জন্য নির্ধারিত হোটেলে পৌছলাম। হোটেলে ঢুকে তো আমি অবাক। কারণ হোটেলের বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই বাংলাদেশি এবং ভারতীয় মুসলমান। মাকে নিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকলাম। তবে এ ধরনের হোটেলে খাবারের ব্যবস্থা থাকে না। তাই ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার কিনতে বাইরে গেলাম এবং একটি বাংলাদেশি হোটেল থেকে বাংলা খাবার বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ আলু ভর্তা, ডিম ভাজি, ভাত, মসুর ডাল এবং গরুর মাংস কিনে হোটেলে ফিরে মাকে নিয়ে লাঞ্চ সারলাম। তারপর সুখকর বাঙালি দিবানিদ্রা। তিন চার ঘন্টা ঘুম শেষে আসরের নামাজের আজান শুনে হোটেল থেকে কয়েক ব্লক পরে সৌদি আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ মসজিদে নববীতে গেলাম মাকে নিয়ে। ১০ মিনিটের হাঁটা পথ)। আসরের নামাজ পড়লাম। এখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা আছে। নামাজ শেষে পুরো মসজিদটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করলাম। এই করে করে মাগরিবের আজান পড়লো। মাগরিবের নামাজ শেষে আবার আগের মত মসজিদের আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম। পথে অনেক বাংলাদেশিদের সাথে দেখা ও কথা হলো যাদের অনেকে এই শহরে ৮-১০ বছর ধরে রাস্তায় এবং মসজিদে ক্লিনারের কাজ করছে।

এরপর পাশের বিরাট সাত তারকা হোটেলের শপিং মলে গেলাম। ওখানে এক ঢাকাইয়া কুট্টিকে পেলাম যিনি ৭/৮ জন মহিলার বিরাট এক বহর নিয়ে স্বর্ণের দোকানে ঘুরছেন। কথা হলো ওনার সাথে; বাঙালি বলে কথা প্রসঙ্গে জানলাম এটি তার ১৭তম হজ্ব এবং প্রত্যেকবারই সাথে বৌ, মেয়ে, নাতনী, শ্যালিকা সম্পর্কীয়দের নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করায় মৃদু হেসে বললেন, ৭/৮ জন মহিলা নিয়ে প্রচুর খাঁটি স্বর্ণের গহনা কিনে এয়ারপোর্ট ম্যানেজ করে ঢাকার স্বর্ণবাজারে উচ্চদামে বিক্রি করেন। এটাই তার বাৎসরিক ব্যবসা। এক ঢিলে ২ পাখি মারা আরকি। হজ্বও করা হলো এবং ব্যবসাও হলো। অবশ্য ধর্মেও এটা নিষিদ্ধ নয়, হজ্বের সময় নাকি ব্যবসাও করা যায়, তবে সেটা সৎ ব্যবসা হতে হবে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের এটা সৎ নাকি অসৎ ব্যবসা সে প্রসঙ্গে আর নাই বা গেলাম।

দুই তিন ঘণ্টা পরে এশার নামাজের আজান হলো, আমরা মসজিদে ফিরে নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট গেটে এসে

মার জন্য অপেক্ষা করলাম। ২/৩ ঘন্টা অপেক্ষা করলাম, কিন্তু মা আর ভিতর থেকে বের হচ্ছেন না। আমি স্বভাবতই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছিলাম। যেহেতু মা বয়স্কা মানুষ, কোথায় কি হলো, কোন অসুবিধা হলো কিনা। তবে ঠিক ৩ ঘণ্টা পরে মসজিদের গেট যখন আপাতত বন্ধ হবে, তখন দেখি মা বেরিয়ে আসছেন আরেক ভদ্রমহিলার হাত ধরে। আমি দৌড়ে মার কাছে গেলাম এবং ঐ মুহূর্তে চোখের পলকে ভদ্রমহিলা স্রেফ উধাও হয়ে গেলেন। আমি তাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য পাশে তাকালাম কিন্তু তিনি সেখানে বা আশেপাশে কোথাও নেই, শুধু স্বর্গীয় এক সুগন্ধী ছাড়া আমি আর কিছুই পেলাম না। অলৌকিক ঘটনাই বটে। হোটেলে ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এতো দেরি হলো কেন এবং ঐ মহিলা কে যিনি তোমাকে হাত ধরে আমার কাছে দিয়ে গেলেন। মা বললেন, 'আমি জানি না উনি কে। কারণ নামাজ শেষে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে হঠাৎ দেখি আমার হাত ধরে ঐ মহিলা টানছেন এবং বাংলায় বলছেন, বাইরে চলুন, আপনার ছেলে আপনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আমার ছেলে যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন এটা আপনাকে কে বললো, আমি তো আপনাকে চিনি না, আমার ছেলেকেও আপনি চিনেন না। উনি মৃদু হেসে মাকে বাংলায় বললেন, 'কথা না বলে আমার হাত ধরে আমার সাথে আসুন'। তারপরেই আমি ওনার সাথে বেরিয়ে আসলাম এবং তোকে দেখলাম।' আসলেই এটা এক আশ্চর্য ঘটনা, যার ব্যাখ্যা আমার মা দিতে পারেননি এবং আমিও আজ পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। আট দিন পরে মক্কা ফিরে হোটেলে এক বাঙালি হুজুরকে জিজ্ঞেস করায় উনি বললেন, মদীনায় আমার মাকে সাহায্যকারী ঐ মহিলাটি ছিলেন একজন জ্বিন– যারা নাকি প্রতি ওয়াক্তেই মানুষের বেশ ধরে নামাজ আদায় করে নিজেরাও ধন্য হচ্ছে।

আধুনিক পাঠক হয়তো এটা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বলা আছে– আমি (আল্লাহ), জ্বিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য এবং শুধুমাত্র এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টিই হাশরের ময়দানে শেষ বিচারের সম্মুখীন হবে।

ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় পর্বে আমি আমার মদীনা ও মক্কা জীবনের আরো কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা জানাতে চেষ্টা করবো।■

● লেখক : প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন (এবিসি), ঢাকা

রোগ প্রতিরোধে দেশীয় ফল

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

ডেউয়া

গ্রাম বাংলার এক সময়কার অতি জনপ্রিয় ফল বর্তা বা ডেউয়া। এখনো জনপ্রিয় কিন্তু আগের মতো তেমন দেখা যায় না। আগে প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে দেখা মিলতো দু'একটা গাছ। ফলটি ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বলা যায় এক ফলের অনেক নাম। চট্টগ্রামে বর্তা, সিলেটে ডেওয়া-চাম, বরিশালে ডেউয়া/ডেওয়া, ডেহুয়া, ডেওফল, বন কাঁঠাল, মগ ভাষায় মিয়ালো, গারোদের ভাষায় আরমু ইত্যাদি নামে পরিচিত। ডেউয়ার বৈজ্ঞানিক নাম Artocarpus lacucha এবং গোত্র বা পরিবার Moraceae। ডেউয়া মূলত কাঁঠাল পরিবারভুক্ত। এটি দেশীয় গাছ হিসেবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বুনো পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কম-বেশি চোখে পড়ে।

ডেউয়া মাঝারি আকৃতির পাতাঝরা বৃক্ষ। উচ্চতায় ১২-১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ড সোজা, গোলাকার, অনেকসময় লিকলিকে এবং বাকল অমসৃণ, গাঢ় বাদামি বা ধূসর বর্ণের। গাছটির বিভিন্ন অংঙ্গ ভেঙ্গে গেলে দুধের মতো সাদা ক্ষীর বা কষ বের হতে দেখা যায়। পাতা আয়তাকার, পুরু, খসখসে, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। প্রাপ্তবয়স্ক গাছে গুচ্ছাকারে ক্রিম-হলুদ বর্ণের ফুল ফোটে। একইগাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে ধরে। স্ত্রী ফুল থেকে ফল হয়। ফল কাঁঠালের মতো, তবে আকারে ছোট, গোলাকার, অসমান, খসখসে ও একাধিক ভাঁজযুক্ত। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পরিপক্ক ফল হলদে-সবুজ থেকে কমলা-লালচে বর্ণের হয়। অনেক সময় কাঁচা ফল ধানের ভুষির ভেতরে রেখে দিলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পেকে যায়। পাকা ফলগুলোর খোসা (আবরণ) বেশ পাতলা এবং ভেতরের অংশ ফ্যাকাসে হলুদ বা কমলা-লালচে বর্ণের এবং নরম, মাংসল ও ভক্ষণীয়। ফলের প্রতিটি কোয়ার সাথে বীজ থাকে। ফলের হলুদ পাল্পের মধ্যে বীজগুলো ছোট গোলাকার সাদাটে বর্ণের। বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশবিস্তার হয়।

ফলের হলুদ পাল্প ভক্ষণীয় এবং স্বাদে হালকা টক-মিষ্টি। পাকা ফল লবণ-মরিচ মাখিয়ে খেতে বেশ মজা। ফল ক্ষুধা ও শক্তিবর্ধক। ডেউয়ার বীজ ভেজে বা পুড়িয়ে খাওয়া যায়। পানের সাথে বাকল চিবিয়ে খাওয়া হয় এবং মানবদেহের ক্ষত শুকাতে কার্যকর। গাছের শিকড় থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যায়। কাঠ হলুদাভ বাদামি বর্ণের, মধ্যম ভারী ও টেকসই। ঘর-বাড়ি নির্মাণে কাঠ ব্যবহৃত হয়। এর লম্বা নলাকার গুঁড়ি কেটে আস্ত নৌকা/ডিঙ্গি বানানো হয়। এতো জনপ্রিয় ফলটির কথা মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে ফলটি অপরিচিত বললেও ভুল হবে না। গ্রামে-গঞ্জেও নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলে-মেয়েরা বিখ্যাত দেশীয় ফলটি চিনতে পারে না। আমাদের উচিত চমৎকার ফলটি নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তোলা, অন্যথায় একসময় কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে হয়তো কোন একদিন বিলীনও হয়ে যেতে পারে।

পাইন্যাগুলা

'পাইন্যাগুলা গাছত নাই/পোয়া ঢুলাইত মনত নাই।' এটি চট্টগ্রামের খুবই প্রাচীন এক ঘুম পাড়ানো গান। শিশুদের ঘুম পাড়াতে পল্লী অঞ্চলের তরুণী মায়েরা দোলনায় দোল দিতে দিতে গানটি গেয়ে শুনাতেন তাদের শিশু সন্তানদের। গানটি শুনতে শুনতে মাতৃত্বের পরশ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তো নিভৃত গ্রামের অগনিত শিশু। এখন এসব লোকগাঁথা। বর্তমান মায়েরা যেমন ভুলে গেছে এসব প্রকৃতির গান তেমন শিশুরাও আর গান শুনে ঘুমাতে যায় না। তারা নিদ্রা যায় টিভিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কিংবা মোবাইল ফোনের মিউজিক শুনে। যন্ত্রযুগ মুছে দিয়েছে মায়ের মুখের সেই কালজয়ী গান। যাইহোক, পাইন্যাগুলার বৈজ্ঞানিক নাম Slacourtia indica এবং গোত্র; Slacourtiaceae।

পাইন্যাগুলার আরো কিছু নাম রয়েছে, যেমন: বৈঁচি বা বঁইচি, লুকলুকি। এটি সাধরণত ঘন ঝোপ-জঙ্গলের ভেতরে বেড়ে ওঠে। লোকালয়ে তেমন দেখা যায় না। তবে আগের দিনে অনেকে সখ করে বাড়িতে লাগাতেন। বৈঁচি বা লুকলুকি বা পাইন্যাগুলা একটি মিষ্টি ও সুস্বাদু দেশীয় বুনো ফল। এটি ঘন ডালপালায় বিস্তৃত ঝোপালো ধরনের বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। বনে-জঙ্গলে ৫০-৬০ বছরের একটা বৈঁচি গাছের উচ্চতা প্রায় ৩৫-৪০ ফুট এবং কাণ্ডের বেড় ৩-৪ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৈঁচি গাছের প্রতিটি পাতার গোড়াতে একটা করে সুঁচালো বড় কাঁটা থাকে। কাঁটাগুলো শরীরের কোথাও বিঁধলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। বৈঁচির পাতা দেখতে অনেকটা কুলের পাতার মতো। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ক্ষুদ্রাকৃতির ফুল ধরে। বৈঁচির ফল মটর দানার চেয়ে সামান্য বড় এবং গোলকার। কাঁচা ফল হালকা সবুজ বর্ণের এবং পাকা ফল জাম বা কালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। ফলে রয়েছে প্রচুর টসটসে রস। ফলের মধ্যে শক্ত বিঁচি থাকে।

বৈঁচির ফল ভক্ষণীয়, সামান্য টক এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত। বৈঁচি বা পাইন্যাগুলা ফলে রয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ আয়রন, সালফার, ফসফেটও ভিটামিন সি। ওষুধি ফল হিসেবে পাইন্যাগুলার বেশ কদর রয়েছে। এ ফল খেলে হজমশক্তি ও লিভারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। হৃদরোগীদের জন্য এটি উপকারী ভেষজ ঔষধের কাজ করে। তাছাড়া এর পাতা ও ফল ডায়রিয়া রোগের প্রতিরোধক। শুকনো পাতা ব্রংকাইটিস রোগের জন্য বিশেষ উপকারী। এর শিকড় দাঁতের ব্যাথা নিরাময়ে কাজ করে। বৈঁচি গাছের শিকড়ের রস নিউমোনিয়া এবং পাতার নির্যাস জ্বর, কফ ও ডায়রিয়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। অনেকে সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে পাতা ও শিকড় ব্যবহার করে। বাকলের অংশ তিলের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে বাতের ব্যথা নিরাময়ে মালিশ তৈরি করা হয়।

জিলাপি ফল

বিলুপ্তির পথে জিলাপি ফল। বিচিত্রময় সৃষ্টির এক এক করে সুন্দর নিয়ামতগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা আর জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে। এই রহস্যময় পৃথিবীতে বহু রকমের ফল রয়েছে। এ রকম একটি বিচিত্র ফলের নাম জিলাপি ফল। এই ফল দেখতে অনেকটা জিলাপির মতো বলে এমন নাম। কেউ কেউ আবার একে বলেন খৈ ফল, আবার অঞ্চলভেদে অনেকেই একে খইয়ের বাবলা বা দখিনী বাবুলও বলে থাকে। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম pithecellobium dulce, পরিবার liguminosae. গ্রিক পিথেসেলোবিয়ামের অর্থ 'বানরের ফল' আর লাতিন ডুলসি মানে মিষ্টি। এই ফল দু'টি খোসার মধ্যে শাঁস ও বীজ গোলাকারভাবে মালার মতো সাজানো থাকে। প্রতিটি ফলে বীজদানা থাকে আট থেকে ১০টি। এই ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে কিন্তু পাকলে এর খোসা টকটকে লাল হয়ে ফেটে যায়। এর বীজ দেখতে শিমের বীজের মতো এবং বীজের রঙ অনেকটা কালো। এর শাঁস পুরু, নরম, মিষ্টি ও কষ্টা।

জিলাপি ফলগাছের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা লম্বা, এলোমেলো, বাকল ধূসর এবং তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত। এর পাতা সবুজ এবং পাতা জোড়ায় জোড়ায় সংযুক্ত থাকে। এর ফুল ফাল্গুনে ফোটে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই ফল পাকে। জিলাপি ফলের বীজ থেকে সহজে চারা হয়। তবে নতুন গাছ সৃষ্টির জন্য এর শাখা কলমও ব্যবহার করা যায়। ফিলিপাইনে এ গাছ প্রধানত ফলের জন্য আবাদ করা হয়। আমাদের দেশে এই ফল এমনিতেই হয়ে থাকে। তবে অনেকেই শখ করে বাড়ির চার দিকে, রাস্তার পাশে এ ফলের গাছ লাগিয়ে থাকেন। যশোর, খুলনা, বরিশাল, পুটয়াখালী ও ভোলায় যথেষ্ট পরিমাণ জিলাপি ফলের গাছ দেখা যায়।■

● লেখক : উন্নয়নকর্মী ও পরিবেশবাদী আন্দোলনের নেতা

কৃষির উন্নয়নে এনজিও সেক্টরের অবদান

এবিএম তাজুল ইসলাম

জমিদার, জোতদার, মহাজন আর দাদন ব্যবসায়ী– শহুরে মানুষের কাছে এগুলো নিছক কিছু নাম বা পদবী হলেও গ্রামের গরিব চাষী আর গৃহস্থের কাছে এককালে এই নামগুলোই ছিল এক মূর্তিমান আতঙ্ক। সহজ সরল গরীব কৃষকের সর্বশান্ত হওয়ার ইতিহাসে এই নামগুলো জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

সুখী মানুষ সবাই একরকম, দুঃখীদের দুঃখের বহু কারণ। বেঁচে থাকার তাগিদে দু-বেলা আহারের সংস্থানে কৃষি কাজের জন্য গরীব কৃষক চড়া সুদে ঋণ নিতো জোতদার, মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। ফলাফল হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির পর অর্ধেক মূল্যে উৎপাদিত ফসল মহাজনের কাছে বেচে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা। অসচ্ছল কৃষকরা ছিল মূলত মহাজনের দাস যাদের জীবিকার নাটাই থাকত মহাজনের হাতে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে শোষণের ইতিহাসের এই সামন্তপ্রভুরা সময়ের পালাবদলে এখন আর বিরাজমান নেই। মহাজন, দাদন ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে কৃষককে বের করে আনার ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহ (এমএফআই) অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষি কার্যক্রমে এনজিও-এমএফআই এর ভূমিকা: ২০০০ সালে জাতিসংঘ Millennium Development Goal (MDG) বা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঘোষণা করে যা শেষ হয় ২০১৫ সালে এবং বাংলাদেশ এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

MDG'র প্রথম লক্ষ্যই ছিল 'চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা' যা কৃষি কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অনেকাংশেই অর্জিত হয়েছে এবং এ অর্জনের হাত ধরে বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে এবং একই সাথে দারিদ্র্যের হার কমে তা নেমে এসেছে ২১.৮ শতাংশে কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এই হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। MDG লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক অবদান রেখেছে এবং বর্তমানে SDG লক্ষ্য পূরণেও সরকারের পাশাপাশি এনজিও বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা SDG'র সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করছে। কারণ এককভাবে সরকারের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয় এবং আমাদের দেশের মত অপ্রতুল সম্পদ ও অধিক জনসংখ্যার দেশে এ কথা আরো বেশি বাস্তব।

মাত্র কয়েক বছর আগ পর্যন্ত আমাদের কৃষি কার্যক্রম ছিলো মূলত জীবকা নির্ভর কৃষি (Subsistence Agriculture) অর্থাৎ কৃষক সাধারণত পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দ্যেশেই কৃষি কাজ করত এবং চাহিদার অতিরিক্ত ফসল বিক্রি করতো। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে কৃষি কার্যক্রমে ঋণের ব্যাপক চাহিদা তৈরী হয়েছে এবং এ খাতে ঋণ প্রবাহ অনেক বেড়েছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় ঋণ সুবিধা পৌছানোর ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সামর্থ্য কতটুকু? পরিসংখ্যান বলে এ সামর্থ্য মাত্র ১৭ শতাংশ কারণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল বিবেচনায় এ কার্যক্রম পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা একটি অন্যতম বাস্তবতা।

এক্ষেত্রে কৃষকের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ

যোগানে মূল ভুমিকা পালন করছে দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কারণ বাস্তবিক কারণে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কৃষিঋণ প্রদানে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পক্ষে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় ঋণ কার্যক্রম প্রদান করা এক কথায় অসম্ভব। চাহিদা মাফিক সহজে ও দ্রুততার সাথে ঋণ সুবিধা প্রদানের কারণেই আজ দেশের কোটি কোটি ঋণ গ্রহীতার কাছে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক আস্থার জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও বৈচিত্রময় খাত যা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, অবহেলিত এবং ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত প্রায় ৪ কোটি গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই কৃষি ঋণগ্রহীতা সদস্য। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র (MRA) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬ শত ২৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে শুধুমাত্র MRA'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শত ১৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ হয়েছে। এটা সমগ্র খাতের প্রায় ৮৩ ভাগ এবং আর্থিক দিক থেকে বিতরণকৃত এ ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশই হচ্ছে কৃষি ঋণ। শুধু MRA'র এই প্রতিবেদনই নয়, অতীতের যে কোন পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়তে কৃষি ভিত্তিক যে কোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের এনজিও-এমএফআইসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

Credit and Development Forum (CDF) কর্তৃক ২০২০ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধুমাত্র CDF এর আওতাভুক্ত ৪৯৬টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৩০ জন কৃষকের মধ্যে ৭২ হাজার ৬ শত ৫৮ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৪৫.৬৭ ভাগ। অপরদিকে একই সময়ে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর কর্তৃক বিতরণকৃত কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার ৬ শত ২০ কোটি টাকা যা এনজিও-এমএফআই কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের ৩ ভাগের ১ ভাগ। কৃষি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে প্রান্তিক কৃষকদের অর্থের যোগান দিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরিসীম ভূমিকা রেখে চলেছে, যদিও এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নাই।

কৃষকের কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এনজিও খাতের ভূমিকা : দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষি খাতে বিনিয়োগসহ কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সর্ম্পকে স্বচ্ছ ধারনা দেওয়া ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এক্ষেত্রে এনজিও-এমএফআই কর্তৃক কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি বিষয়ক বাস্তব ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, এছাড়া মানসম্মত বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রাম ও কৃষি অঞ্চলগুলোতে বেকারত্বের হার কমে পরিবারগুলোয় আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে।

এছাড়া পশু পালন ও হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মাছ চাষের ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রতিপালন ও চাষ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সমন্বিত খামার স্থাপনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করে সমন্বিত খামার স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে উৎপাদনকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতাসহ নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে এনজিও-এমএফআইসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করে চলেছে এবং এ-সব কিছুই চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত আছে। এছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা এবং এ সমস্যা মোকবেলায় সরকারের পাশাপাশি দেশের এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জলবায়ুর উপযোগী ফসলের জাত ও প্রতিকুল পরিবেশে ফসল উৎপাদন কলা কৌশল বিষয়ে দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক কৃষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ কৃষি উপকরণ সরবরাহে বিভিন্ন দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও খাতের ভূমিকা অপরিসীম। MDG অর্জনে দেশের এনজিও খাত বিশেষ অবদান রেখেছে কিন্তু তার প্রকৃত স্বীকৃতি নেই। জাতীয় অর্থনীতিতে এনজিও-এমএফআই এর ভূমিকার স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে, এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সনদ বা স্বীকৃতি অর্জন করলেও এখনো জাতীয়ভাবে এই সফলতার তেমন কোনো স্বীকৃতি নেই। জাতীয় বাজেটেও আলাদা করে এখনো এনজিও খাতের উন্নয়নে তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও-এমএফআইসমূহ সফল কার্যক্রমের জন্য জাতীয়ভাবে যথাযথ স্বীকৃতি পেলে এই খাত দেশের সার্বিক উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখতে উৎসাহিত হবে।■

● লেখক: সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি বুরো বাংলাদেশ

ক্ষুদ্রঋণে
সচ্ছলতা

নারীর ক্ষমতায়ন

মাহবুব হাসান

অনেকগুলো লিখে বসে রইলাম এক ঘন্টা বত্রিশ মিনিট
তিরিশ সেকেন্ড। রোদের উত্তাপ কমেছে বেশ।
কেটে-কেচে নামিয়ে দিলাম গুলো শব্দটিকে
ফিকে জ্যোৎস্নার মতো লেপ্টে থাকা
অনেকের পিঠ থেকেও–
এখন সে হালকা-পাতলা ছিপ।
গুলো ছাড়া অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটছে সে রাজপথে।

পথ আর একলা থাকে না।
তার মধ্যে নির্জনতার বাস, মানুষের সুবাস, ঘাম,
আর মৃত্যুর হাসফাঁস ছায়াছবি!
কেউ কি চায় মরতে?
ঠেলাঅলা আর লক্ষ-কোটিপতি রাজি নয় মরতে।
আমি কী চাই, জানি না তার কিছু।

আমি নিজেও নির্জনতার মগডালে বসে ভেবে দেখেছি
শব্দরা ভীষণ নিঃসঙ্গ,
উটের কুঁজোর মতো বেঢপ,
সাহারার ঢেউগুলো তার গায়ে হেলেদুলে চলে।

২
ওই রকম গরিব বেঢপ ছিলো আমাদের মা-খালারা,
শৈশবে দেখেছি নিঃসঙ্গ বেদনা তার,
ঝরে গেছে যৌবনের ধার নিয়ে যৌবন না ফুরাতেই!

৩.
আজ পাল্ট গেছে পরিবেশ!
গ্রাম ও তার সংসার এখন আলোকিত রূপসীর মতোন,
তারা কাজ করে, স্বাবলম্বী, তারা ঋণ নেয়, ব্যবসা করে,
তাদের উরু বেয়ে নামে রোজ পরিশ্রমের ঘাম।
তারা ভয় পায় না আর কোনো চোখ রাঙানির,
তারা বেরিয়ে পড়েছে আজ পথে প্রান্তরে, রাজপথে তারা আজ
সহযোগী শক্তি!
সারাদিনমান তাদের শরীরের ঘাম
ঝরে পড়লেও ক্লান্ত হয় না আর।

নারী আর পুরুষের যৌথ-পৃথিবী
আমাদের রাজনৈতিক সংসার।

ক্ষুদ্রঋণে দিনবদলের গল্প

ফেরদৌস সালাম

মঙ্গাক্রান্ত আর্তনাদ দেশ থেকে হয়েছে উধাও
কতোদিন অনাহারে কাটিয়েছি বিষণ্ন প্রহর
অভাবে স্বভাব নষ্ট দুঃখবন্দি বেদনার ঘর
ক্ষুদ্রঋণ কর্মযজ্ঞে ক্ষুধামুক্ত সব কটি গাঁও।

জামানত নেই তবু ঋণ দেয় ব্র্যাক-বুরো-আশা
কোটিজন ক্ষুদ্রঋণে নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছি আজ
ভিক্ষুকের সেই হাতে শোভা পায় কর্মময় সাজ
দেশব্যাপী উল্টে গেছে দাদনের মহাজনী পাশা।

টিভি ফ্রিজ চকচকে বদলানো নতুন জীবন
বিদ্যুৎ বাতির মতো সমুজ্জল সন্তানের মুখ
নেই আজ অর্থকষ্ট গৃহ ভর্তি অনাবিল সুখ
সুস্থ মন সুখী গৃহ বয়ে যায় সুখের পবন।
বেড়ে যায় ক্ষুদ্রঋণ বৃদ্ধি পায় নারীর ক্ষমতা
এভাবেই বিশ্বজুড়ে আসবেই মানুষে সমতা।

জেরুজালেম

মজিদ মাহমুদ

অন্ধকারে ছিল যখন আমেরিকা য়ুরোপ
ভারত ভূমির কথা জানত না বেশি লোক
জানত না কেউ- আমরা কখন সভ্য হলেম
তখনো ছিল- জেরুজালেম! জেরুজালেম!

মুসাকে যেহেতু দিলেন প্রভু অঙ্গীকার
থাকবে এখানে সন্ততি আর সঙ্গী তার
তারাই হয়তো ইহুদি নাসারা আর মোস্লেম
এখানে বসত গেড়েছে সবে জেরুজালেম!

যারা এখানে ঝরায় রক্ত রাত্রি দিন
সভ্যতাকে রেখেছে যারা নিজ অধীন
খুঁজেছে এখানে অমর মানুষ নিকষিত হেম
তবু এখানে রক্ত ঝরে জেরুজালেম!

কে দেবে বল অভঙ্গ সেই তীর ও তুন
কে তাড়াবে সিনাই থেকে ইয়াঙ্কি শকুন
সর্ব ধর্মের প্রার্থনা এখানে মানুষের প্রেম
মানুষ এনেছে সভ্য জগতে জেরুজালেম!

কয়েকটি সুখ দুঃখ

শাফাত শফিক

কয়েকটি দুঃখ মিলে জীবনের বিষাদ আখ্যান
নদীর জলের মতো কান্না অবিরল
কখনোবা অন্তঃসলিলা প্রবাহে বিষণ্ন মোহিনী
মাঝে মাঝে ঘূর্ণির অতলে হারায় জলের সাম্পান
বালুচরে ঝিঁঝি পোকার একটানা নিশীথ রোদন

কয়েকটি সুখ মিলে জীবনের আনন্দ বাগান
অন্ধকারে চমকিত জোনাকি পোকার উড্ডীন উচ্ছলতা
সুপার মার্কেটের চোখ ঝলসানো রঙিন মদিরা।

প্রমোদ রাতি

মাহবুব হাসান সালেহ

কৃষ্ণা প্রিয়া পৌষ কুয়াশা
গায়ে মেখেছে;
মন খারাপের চাদর আমায়
ঢেকে রেখেছে;

কৃষ্ণা মুখের দেখা পাবো
প্রতীক্ষাতে থাকি;
হৃদয় মাঝে হলদে রঙের
সোহাগ ছবি আঁকি।

কৃষ্ণা বচন মধুর মতন
আশ মেটে না মোর;
কথন মায়ায় মুগ্ধ আমি
কাটে না যে ঘোর।

কৃষ্ণা প্রেমে মগ্ন আমি
বারিষ জলে ভাসি;
অধীর প্রাণে শ্রবণ সাধন
অর্ক চূর্ণ হাসি।

কৃষ্ণা গাহন প্রণয় লগন
অভিসারে মাতি;
জোছনা মাখা আলোর মেলায়
মিথুন প্রমোদ রাতি।

ব্রাসেলস, বেলজিয়াম

বিলীয়মানতার গান

কামরুল হাসান

আমি থাকবো না, চামেলীও চলে যাবে বাতাসে কর্পুর,
গন্ধ ছিল কিনা এ প্রশ্নে লোকেরা মাতুক
সে মাতমও থাকবে না কিছুকাল পর
লোকেরা সমস্ত ভোলে, সত্য থাকে
প্রত্যহের প্রভাতের থলি
ইলিশে ভরাতে যায় দিন
কোমলগন্ধার অজস্র চাঁদমুখ আকাশের ছবি হয়ে যায়!

আমি থাকবো না, চামেলীও মিশে যাবে মাটিতে পটাশ
কিছু ঘটেছিল কিনা, এ মীমাংসায় আগ্রহ কার?
সে ফিসফিস মিলিয়ে যাবে কিছুকাল গুনগুন শেষে
লোকেরা সমস্ত ভোলে, সত্য থাকে
দিবসের সকল সজ্জায়
রাত্রির নীরব বজরায়
অনন্তপারের যাত্রী মুহূর্তের কড়ি হাতে সঙ্গোপনে ধায়!

বিফল কামনা

শারমিন সুলতানা রীনা

প্রসন্ন রাত্রির বুকে ঘুমায় প্রকৃতি
আমার চোখের ঘুম হয়েছে বিলীন

সাধের বাসর ঘরে নির্দয় মনসা
শরীর বিষাক্ত করে মরণ ছোবল

হারাই পাওনা যতো বিধির বিধান
অলিক স্বপন সুখ সয়না কপালে

আঘাতে আঘাতে ভাঙে সকল প্রত্যাশা
রুপালী প্রভাত যার বিফল কামনা

ধারণ করেছি বুকে সাধের মিনার
মায়াবী চাঁদের ছায়া সাধ্য কি ছোঁয়ার?

কি আছে?

মৌ মধুবন্তী

এইখানে জাগরণে আছে মা-আধেক ঘুমে
কিংবা
গাঢ় নিদ্রায় আছে বাবা, বিবাগী বর্ষার এই আষাঢ়ে
আছে শান বাঁধানো হাহাকার ;বুকের ভেতরে গম্ভীরা
মেঘ বাহারে বেজে ওঠে হারানো দিনের ব্যথা,
সুরের কাফেলা, কিন্নর মধুরিমা, ঈষদোষ্ণ বেহাগ তালিম।
নিজস্ব বলতে শুধু তুমি।

বিনায়ক যন্ত্রে বৃন্দাবন মথুরা
রাধার আঁচলে পড়ে সময়ের টান
সেই আমি আজো অচল নৌকায় বসে
কৃষ্ণের বাঁশী খুঁজি।
মা এসে নিয়ে যায় হাত, বাবা নিয়ে যায় বাঁশী
দু'জনেই একসাথে আছে কাছাকাছি
বর্ষা আর বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মেখে মেখে
দু'জনে মিলেই আষাঢ়স্য আষাঢ়।

টরন্টো, কানাডা

ছোটগল্প

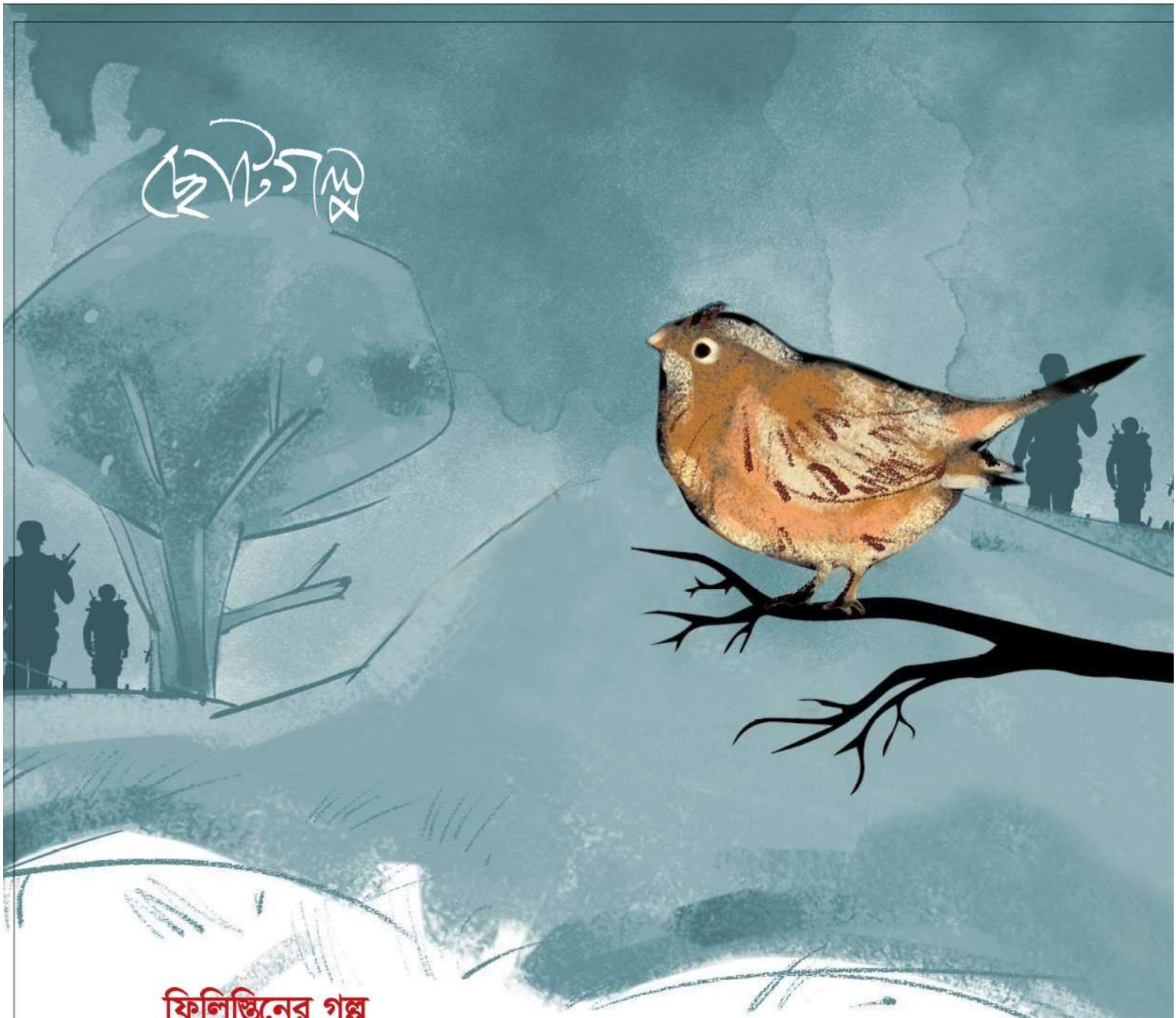

ফিলিস্তিনের গল্প

একটাই আকাশ

লিয়ানা বদর
অনুবাদ : বিদ্যুত খোশনবীশ

পিচঢালা পথ আর পর্বতদেহের মাঝখানে নুড়িপাথরের বেশ উঁচু একটি স্তূপের উপর সে দাঁড়িয়ে ছিলো। নিশ্চল দেহ আর জমাট দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল মোমের পুতুলের মতো। একটি কালো চোখ তখনও দ্যুতিময়! দাবার ছকে বীরযোদ্ধার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির মতো ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি আমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো। সামান্য ঝুঁকে ওকে হাতে তুলে নিলাম। পাখি নয়, যেন এক টুকরো জমাট বালু হাতে নিয়েছি আমি। ওর অন্য চোখটি বন্ধ ছিল; পাতা ফুলে পুরো চোখটাকেই ঢেকে গেছে। দুই চোখের মাঝখানে লাল ক্ষত। ক্ষতস্থানের নিচের সবগুলো পালক ওঠে গেছে। বুঝাই যাচ্ছিলো, কোন এক শিকারি পাখি বার বার ঠোকর দিয়েও ওকে পরাস্থ করতে পারেনি। তবে আমার বন্ধুদের একজন বলল, 'রাস্তায় খাবার খোঁজার সময় গাড়ির ধাক্কা লেগে থাকতে পারে, পাখিরা সাধারণত চলন্ত গাড়ির উপস্থিতি আঁচ করতে পারে না।' তবে আরেক বন্ধু আমার অনুমানকেই সমর্থন করে বলল, 'বাজ কিংবা চিলের কাজ।' তিউনিশিয়ান স্টাইলে নীল সুতোয় কারুকাজ করা একটি পাতলা রেশমী চাদর আমার গলায় ছিল। ওটা দিয়ে মুড়িয়ে পাখিটাকে আলতো করে হাতে তুলে নিলাম। একটুও ঘাবড়ায়নি। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, কারণ বসন্তের শুরুতে হুটহাট বদলে যাওয়া আবহওয়ার জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাদরটি সাথে রেখেছিলাম আর একটি আহত পাখির জীবন বাঁচাতে ওটা বেশ কাজে লেগে গেলো। পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এক টুকরো নীল আকাশ আমাদের পথচলার দর্শক হয়ে আছে। শীতের পর আকাশের এতো ঔজ্জ্বল্য এই প্রথম আমার চোখে পড়ল। যতটুকু সম্ভব পাখিটাকে আমি বুকের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করছিলাম।

আমার হৃদস্পন্দন থেকে ওর ক্লান্ত দেহ কিছুটা হলেও উষ্ণতা পাবে সে আশায়। একটি আহত পাখি মধ্যাকর্ষণ জয় করে উঁচু ঢিবিতে উঠে আত্মরক্ষা করেছে- নিঃসন্দেহে ওর মনের জোর আমাদের চেয়েও বেশি।

ইসরাইলি সেনাদের নির্মিত অস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম একটি প্রাণোচ্ছল পথ ধরে। দিন কয়েক আগেও এই পথ মৃতপ্রায় ছিল। কারণ গত দেড় মাস ধরে আমাদের শহরকে বিধ্বস্ত করতে আসা দানবীয় ট্যাংক আর সাজোয়া যানগুলো এ-পথ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে সেদিন আমাদের পায়ের পাতাগুলোও ছড়ানো-ছিটানো নুড়ি পাথর ভেদ করে একটি মুক্ত নগরীর শক্ত মাটির অস্তিত্ব উপভোগ করছিল। কিন্তু এই মুক্ত পথচলার মাঝেও আমাদের অনুভূতিকে বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছিল সেনাদের জিপে লাগানো লাউড স্পিকার থেকে ভেসে আসা সতর্কবার্তাগুলো। প্রাণঘাতি ভাইরাস যেভাবে তরতর করে বংশবৃদ্ধি করে, সেনাদের একই কথার পুনরাবৃত্তি সেভাবেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল চারপাশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে যেতে আমরা ছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেনাদের ছোড়া বিষাক্ত গ্যাস আর টানা কার্ফিউ এর কারণে রাস্তায় ময়লা-আবর্জনার স্তূপ জমে গেছে। দুর্গন্ধ উপেক্ষা করেই আমরা হেঁটে চললাম। আসলে, ঘর নামক বন্দীশালা থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও পালাতে চাইছিলাম আমরা। সেদিনের ওই পদযাত্রা ছিল আমাদের গায়ে বর্মের মত চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধ থেকে ক্ষণিকের পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু এভাবে ফিলিস্তিনের নীল আকাশ খুঁজতে যেয়ে প্রকারান্তরে আমরা প্রবেশ করছিলাম এক বন্দীশালা থেকে আরেক বন্দীশালায়, এক বিধিনিষেধ থেকে আরেক বিধিনিষেধের সীমানায়। আমরা এমন এক আকাশের খোঁজ করছিলাম, যে আকাশ তার সুপ্রাচীন ঔদার্য নিয়ে তাকিয়ে আছে নিচের পার্বত্য ভূমির দিকে। পাথরের দেয়াল-ঘেরা সমুদ্রের ঢেউ-এর মত এই পার্বত্য ভূমি। এখানকার দেয়ালগুলো জমিনকে আঁকড়ে ধরে আছে রোমান ও ফিনিশিয় আমল থেকে। দেয়াল আর দূর্গের মত ছোট ছোট পাথুরে ঘর। যুগের পর যুগ এ দেয়ালগুলোই রক্ষা করেছে এ জনপদের ফসল আর ভেড়াগুলোকে। অথচ নতুন প্রজন্ম এই পাথরের ইতিহাস মনে রাখেনি।

পাখিটাকে চাদরে জড়িয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। আমার প্রতিবেশী পাখি পুষেন, ছোট খাটো খামারও আছে। তার পরামর্শে আহত পাখিটার নাম দিলাম রবিন। ওর গলায় অসম্পূর্ণ লাল রেখার কারণে আমি কিছুটা সন্দিহান হলেও পাখিপ্রেমী ওই প্রতিবেশি নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, 'ওর বয়স কম, তাই রঙটা পুরোপুরি জেগে ওঠেনি।' পানি ও কিছু শস্যদানা দিয়ে একটি ধাতব চালুনির নিচে রবিনকে রেখে দিলাম। প্রথম দিন অতিক্রান্ত হলো। ওর শরীর তখনও শক্ত ও নিস্তেজ। একবার দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু মনে হলো কেউ ওকে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে। চালুনির রঙের সাথে ওর বিবর্ণ শরীরটা এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে খুব ভালভাবে খেয়াল না করলে ওকে দেখাই যেত না। একটি হলুদ ক্যানারি পাখি পুষতাম। রবিনের অবস্থা দেখে ওই পাখিটির কথা মনে পড়ে গেল। দু'দিন বাড়ির বাইরে ছিলাম। ঝুলন্ত খাঁচাটা কোন কারণে নিচে পড়ে যায়। প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে পাখিটা এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে দানা-পানি ছাড়াই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল টানা দু'দিন। এই স্মৃতি থেকে অনুমান করলাম, দু'এক দিন বাদে রবিনও সুস্থ হয়ে ওঠবে। পাখিরা যত ছোটই হোক না কেন ওদেরও প্রকাশভঙ্গি আছে। নড়াচড়ার ধরন দেখে ওদের সুখ-দুঃখ আন্দাজ করা যায়। রবিনের নিথরতা বলছিল ও সুখে নেই। কিন্তু তারপরও এটুকু ভেবে খুশি ছিলাম যে ও অন্তত একটা নিরাপদ আশ্রয়ে আছে।

পরের দিনও রবিনের কোন নড়চড়া চোখে পড়েনি, তবে সুখের কথা ওর জন্য রাখা শস্যদানার সংখ্যা কমেছে। আরো তিন দিন কেটে গেলো। মূলত ইসরাইলি সেনাদের লাউড স্পিকার থেকে কারফিউ উঠিয়ে নেয়ার ঘোষণা শোনার জন্য ওই তিন দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ওই কটা দিন রবিন নড়াচড়াও করেনি, শব্দও করেনি। আহত চোখটির সামান্য উন্নতি ছাড়া সুস্থতার আর কোন লক্ষণ ওর মধ্যে দেখতে পাইনি। একটু একটু করে ও চোখ খুলছিল ঠিকই কিন্তু তা স্বাভাবিক চোখের মতো ছিল না।

আমি আমার সেই প্রতিবেশির কাছে জানতে চাইলাম, রবিনকে ছেড়ে দেব কিনা। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন: রবিন বন্য পাখি। গৃহবন্দী থাকার যন্ত্রণা খুব বেশিদিন ওর সহ্য হবে না। ভাল হয় দানা-পানি খাওয়া বন্ধ করে দেবার আগেই ওকে মুক্ত করে দেওয়া।

ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরাইলি সেনাদের সংঘর্ষের আশঙ্কায় রাতে আমার ঘুম আসছিল না। বিছানায় বিশ্রী ভঙ্গিতে শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করলাম, অবশ্য আমার শোবার ধরনটাই এমন। না, ঘুম এলোই না। ভোর বেলায় জেগে থাকার তিক্ততা থেকে বাঁচার জন্য আমার সব রকম চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এরকম নির্ঘুম ভোর পুরো দিনটাকে মাটি করে দেবার জন্য যথেষ্ট। রাতে জানালা বেশ শক্ত-পোক্ত করেই লাগিয়েছিলাম। কিন্তু সেনাদের লাউড স্পিকারের শব্দ যেন দেয়াল ভেদ করে আমার কানে আঘাত করছিল। একজন ইসরাইলি সেনা ভুল ব্যাকরণে বিকৃত আরবি শব্দে কিছু একটা ঘোষণা করলো। আরো একটি দিন আমাদের গৃহবন্দী থাকতে হবে নাকি কিছু সময়ের জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হবে– আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারিনি। সকালটা সুখকর হলো না। অনিদ্রার তিক্ততা শরীর ও মনে সমানভাবে জেকে

বসেছে। রবিনকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নেয়া ছাড়া এই অবষাদ দূর করার আর কোন উপায় পেলাম না। সেই রৌদ্রজ্জ্বোল দিনে, যেখান থেকে রবিনকে তুলে এনেছিলাম আজ সেখানেই ওকে রেখে আসব। ছোট্ট এই পাখিটাকে আজ নিয়ে যাব ওর আপন দুনিয়ায়– ফিলিস্তিনের সবুজে, ফিলিস্তিনের নীলিমায়।

হাতে সময় খুব একটা নেই। একটু বাদেই কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ উঠে যাবে। রবিনকে নিরাপদ আশ্রয়ে ছেড়ে এসে বেকারির সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে এবং তারপর গুটি কয়েক শব্জির দোকানেও। ফলে তাড়াহুড়ো করে এক বান্ধবীকে নিয়ে রওনা হলাম শহরের পশ্চিম দিকে। আমার হাতে রবিন, বড় একটি বাটিতে চালুনি দিয়ে ঢেকে রেখেছি। কিন্তু আজ ওই জায়গাটিকে সেদিনের মত অতো সুন্দর লাগছে না। ইসরাইলিদের বসতি স্থাপনের কাজ পুরো দমে শুরু হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনগুলোর বিন্যাসে কোন ছন্দ নেই। রাস্তার ধারে লোহা-লক্কর আর ইট-পাথরের ছড়াছড়ি পুরো পরিবেশটাকে দূষিত করে রেখেছে। রবিনকে যেখান থেকে উদ্ধার করেছিলাম তার আশেপাশে কোন নিরাপদ গাছের সন্ধান করছিলাম আমরা, কিন্তু পেলাম না। কন্সট্রাকশন সাইট থেকে বেশ দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ছোট একটা পাইন গাছ চোখে পড়ল আমাদের। দেখে মনে হলো, ভুলবসত কাটা পড়ার হাত থেকে রেখাই পেয়েছে গাছটি। রবিনকে নিয়ে আমরা নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে চললাম। ছোট ছোট ব্রাম্বল গাছের কাঁটাগুলো আমাদের কাপড়ে বিধে যাচ্ছিল, আমাদের যেন খামচে ধরতে চাইছে ওরা। কিন্তু পাথর আর কাঁটার আঘাত উপেক্ষা করে চূড়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিক দৃঢ়তা আমাদের ছিল। একটি পাখিকে মুক্ত করে দেবার আনন্দের কাছে এসব অতিতুচ্ছ প্রতিবন্ধকতা। আমরা পাইন গাছটির কাছে পৌঁছলাম। আশেপাশের পাহাড়গুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু। এই পাহাড়ের চূড়ায় দন্ডায়মান পাইন গাছটিই সম্ভবত রবিনের নিরাপদ আশ্রয়।

আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দূর থেকে যতটুকু ভেবেছিলাম কাছে আসার পর গাছটিকে ততোটুকু নিরাপদ মনে হলো না। কিন্তু পাথরের গায়ে গজিয়ে উঠা কিছু কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড় ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্পও ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত রবিনের জন্য ওই পাইন গাছটিকেই বেছে নিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল রবিন ঠিক মতোই পুরো ব্যাপারটা সামলে নেবে কারণ কয়েক দিনের গৃহবন্দীত্ব নিশ্চই ওর সহজাত বন্য স্বভাব নষ্ট করে দেয়নি! পাইন গাছের একটি নিচু ডালে রবিনকে বসিয়ে দিলাম। আমাকে হতাশ করে রবিন মাটিতে পড়ে গেল। গাছের ডালটি খামচে ধরতে পারেনি। দৌড়ে গিয়ে ওকে আরেকটি ডালে বসিয়ে দিলাম। পাখি হয়েও রবিন গাছের ডালে বসতে পারছে না। এর অর্থ হলো ওর স্নায়ুবৈকল্য পুরোপুরি কাটেনি। কিন্তু তারপরও বিকল্প কিছু করার সুযোগ আমাদের কাছে ছিলো না। রবিন যতবারই পড়ে যাচ্ছিল আমি ততবারই ডালে বসিয়ে দিচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে ও নিজেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো, তবে খুব বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি, আবারও পড়ে গেল।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল, তবে হাল ছেড়ে দেবার অবকাশ নেই। এই বিলম্ব বিপদের কারণ হবার আগেই এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। এ দফায় রবিনের চেষ্টায় কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। ডালে বসে থাকার স্থায়ীত্ব সামান্য বেড়েছে এবং পড়ে যাবার সময় উড়াল দেবারও চেষ্টা করছে। বাস্তবতা হলো, রবিনকে সাথে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না এবং ওকেও দ্রুত উড়ার শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে আমরা চলে যাবার পর ওকে বিড়ালের পেটে যেতে হবে। আশেপাশের বসতির বিড়ালগুলোর এদিকে আনাগোনা আছে।

সপ্তম বারের চেষ্টায় রবিন কিছুদূর উড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। এরপর আরো কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা। যদ্দুর মনে পড়ছে, দশম বারের বেলায় রবিন উড়াল দিলো।

হ্যাঁ, রবিন উড়লো।

খুব বেশি উঁচু দিয়ে নয়। তবে এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ওই উচ্চতা যথেষ্ট ছিলো।

অবশেষে রবিন উড়লো এবং আমাদের দৃষ্টি সীমা থেকে হারিয়ে গেল।

সেদিনের পর আর কখনই আমি রবিনকে দেখিনি।

যে বসন্তে ডানা ঝাপটিয়ে রবিন অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই বসন্তের শেষ দিকে আমি আরো একবার ওই জায়গাটায় গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম ওই একই উদ্দেশ্যে, ফিলিস্তিনের একখন্ড মুক্ত আকাশের খোঁজে। সেদিন এমন একটা কিছু আমার দৃষ্টিগোচর হলো যা আগেও বহুবার হয়েছে, কিন্তু আমার বোধের জগতে নাড়া দেয়নি। কিন্তু সেদিন দিলো, সঙ্গত কারণেই দিলো। একটি শিকারি পাখি অনেক উঁচুতে ফিলিস্তিনের মুক্ত আকাশে হেলিকপ্টারের মতো চক্কর দিচ্ছিল। নিখুত ধ্যানে সে শিকার খুঁজছে, তার শিকারটি হয়তো রবিনের মতোই ছোট্ট কোন পাখি! আমি বুঝতে পারলাম, এই পার্বত্য ভূমির আকাশে পুরোটা দিন সে ব্যয় করেছে ওই গাছটির উপর চক্কর দিয়ে। প্রতিটা শিকারিই জানে তার শিকার কোথায় থাকে!

একটি সুউচ্চ পার্বত্যভূমি, যার পাহাড়চূড়া ও জয়তুন গাছগুলোর দিকে এক টুকরো নীল আকাশ তাকিয়ে আছে সহস্র বছর ধরে। সমুদ্র দর্শনে বিমুগ্ধ এই পার্বত্যভূমি প্রাচীন যুদ্ধের ইতিহাস বহন করে বার বার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে উপনিবেশের আঘাতে। বুনো লতারা এখনো খামচে ধরে কৃষকের বহু পুরনো পাথর-বাড়ি আর সমুদ্রের পাড়ে একের পর এক বাসা বাঁধে নগরী। যুগের পর যুগ যুদ্ধ চলে, অধিবাসীরা নগরী ছাড়ে আর থিতু হয় অনাহুত অধিবাসী।

এ-সবই ঘটে একই আকাশের নিচে।

এজন্যই কি আমার দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে পাখিটা উড়ে গেছে দূরে! ■

লিয়ানা বদর: লিয়ানা বদর একজন ফিলিস্তিনি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। একই সাথে তিনি কবি, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালকও। তার জন্ম ১৯৫০ সালে, জেরুসালেমে। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছেন জর্ডান ও বেইরুত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'আ কম্পাস ফর সানফ্লাওয়ার'। 'আ ব্যালকনি ওভার দ্য ফাকিহানি' এবং 'দ্য আই অব দ্য মিরর' তার প্রকাশিত পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লিয়ানা বদর-এর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে চারটি ছোটগল্প সংকলন, দু'টি কাব্য ও চারটি প্রবন্ধ সংকলন। অনূদিত এই গল্পটি বিখ্যাত সাময়িকী বানিপালে প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে বেকি ম্যাডক এর ইংরেজি অনুবাদে।

পরিশ্রমী দোকানী লাইলী বেগম

কামরুন নাহার

লাইলী বেগম। বুরো বাংলাদেশের কুতুবপুর শাখার ২১ নম্বর কেন্দ্রের নিয়মিত সদস্য। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ কোন নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানব জীবন যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তেমনি এক জীবনের গল্প আমাদের লাইলী বেগমের। তিনি তার স্বামী-সন্তান নিয়ে বাস করেন ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার কৈয়াদী গ্রামে। অনেক টানাপোড়নের জীবন তার। খুব অল্প বয়সেই অতি দরিদ্র বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দেন তাকে। দুঃখ যেন তার নিত্য সাথী। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তার কোলে আসে প্রথম কন্যা সন্তান। এর দুই বছরের মধ্যেই আরও দুই জন ছেলে সন্তান। লাইলী বেগমের স্বামীরও ধরা পরে বিভিন্ন রোগ। এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে সংসারের হাল নিজের কাঁধে নিয়ে অন্যের জমিতে দিন মুজুরের কাজ শুরু করেন লাইলী বেগম। যা পারিশ্রমিক পেতেন তাতে অসুস্থ স্বামী-সন্তান নিয়ে কখনও এক বেলা, কখনও বা না খেয়েই দিন-রাত পার করেছেন। দুঃখ-কষ্টের পরও লাইলী বেগমের মনে ছিল অসীম সাহস আর সাথে ছিল তার স্বামীর মানসিক সহযোগিতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার কষ্টের জীবন এক দিন না এক দিন শেষ হবেই। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন অবিরত। তার মনের ডাক শুনেই হয়তো বুরো বাংলাদেশ এসেছিল অপার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।

সময়টি ছিল ১৯৯৯ এর শেষের দিকে। লাইলী বেগম তার কিছু প্রতিবেশীর কাছে বুরো বাংলাদেশের কথা জানতে পারেন। পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের কর্মী ভাইদের কাছে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন যে বুরো বাংলাদেশ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা কিনা অস্বচ্ছল মানুষদের খুবই সহজ শর্তে ঋণ দেয়। পরিবারের সবার সম্মতি নিয়ে প্রথমে তিনি সদস্য হন টাঙ্গাইলের সখিপুর অঞ্চলের তৎকালীন বড়চওনা (বর্তমানে কুতুবপুর) শাখায়। মনে অগাধ আশা নিয়ে লাইলী বেগম প্রথম এসেছিলেন বুরো বাংলাদেশ এ ঋণ নেয়ার জন্য।

সব দিক বিবেচনা করে তাকে ঋণ দেয়া হয় ১৪ হাজার টাকা। এভাবেই তার জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের শুরু। একনিষ্ঠ চেষ্টা আর সততার জোরে লাইলী বেগমকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দ্বিতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিচিত এক ব্যক্তির জায়গায় বসে শুরু করলেন ছোট্ট একটি চা'য়ের দোকান, সাথে মনিহারি ব্যবসা।

ব্যবসায় সফলতা পেয়ে এবং ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে তৃতীয় দফায় ঋণ নেন ১ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে এবার তিনি কৈয়াদী বাজারে এক শতাংশ জমি কিনলেন এবং বানালেন নিজের চা'য়ের দোকান। যে লাইলী বেগম মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কাজ করে সংসার চালাতেন, এখন সেই লাইলী বেগমের নিজস্ব চা'য়ের দোকান! তিনি যেদিন এই দোকানের মালিক হন সেই দিনটি ছিল লাইলী বেগমের কাছে স্বপ্নের মতো।

চতুর্থ দফায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজ দোকানের জায়গা পাকা করেন এবং দোকানের সাথেই বসত বাড়ির জন্য আরও এক শতাংশ জায়গা কেনেন। ধীরে ধীরে ব্যবসাতে আরও বিনিয়গ বাড়াতে থাকেন। লাইলী বেগম তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ভালো ঘরে। বড় ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন এবং ছোট ছেলেকে একটি মটর চালিত ভ্যান কিনে দিয়েছেন। বর্তমানে লাইলী বেগম বুরো বাংলাদেশের ৩ লক্ষ টাকার ঋণের কিস্তি নিয়মিত চালাচ্ছেন। নিজের চা ও মনিহারি দোকান নিজেই চালান তিনি। দোকানের আয় এবং প্রবাসী ছেলের পাঠানো টাকায় সংসারে এখন অভাব নেই বললেই চলে। তার ছোট ছেলে প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে ৩০০-৪০০ টাকা মা'য়ের হাতে তুলে দেয়।

সৎ,পরিশ্রমী ও সফল দোকানী লাইলী বেগম। তিনি ও তার জীবনের গল্প আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে। বুরো বাংলাদেশের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর বুরো বাংলাদেশও তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছে লাইলী বেগমের মতো হাজারো নারীর মুখে সাফল্যের হাসি ফোঁটাতে।■

● শাখা ব্যবস্থাপক, সীমান্তবাজার শাখা
সিরাজগঞ্জ অঞ্চল, বুরো বাংলাদেশ

নিপু ত্রিপুরা ▮ পাহাড়ি নারীর গল্প

আবুল বাশার

খাগড়াছড়ির ঠাকুরছড়া নতুন বাজার গ্রামের আদিবাসী যশু ত্রিপুরা। দারিদ্রের কষাঘাতে খুব দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে দিন অতিবাহিত করছিলেন তিনি। অভাব অনটনের মধ্যে তাদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছিল। এমন সময় যশু ত্রিপুরার স্ত্রী নিপু ত্রিপুরা ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখে মাশরুম চাষে উৎসাহিত হন। পরে মাশরুম চাষ এবং মাশরুম এর বীজ উৎপাদনের উপর কয়েকটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। এরই মধ্যে যশু ত্রিপুরার পরিচয় হয় বুরো বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি শাখার এক কর্মীর সাথে। তার কাছ থেকেই বুরো বাংলাদেশের আর্থিক সেবার কথা শুনে সদস্য হয়ে যান খাগড়াছড়ি শাখায়।

২০১৮ সালে বুরো বাংলাদেশ থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়ে স্ত্রী নিপু ত্রিপুরাকে সাথে নিয়ে মাশরুম চাষ শুরু করেন। এরপর এই দম্পতিকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। মাশরুম চাষে তাদের সফলতা আসে। ২০২০ সালে ৩ লক্ষ টাকাসহ এ পর্যন্ত এই দম্পতি বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়েছেন ৬ ছয় লক্ষ টাকা।

সফল উদ্যোক্তা নিপু ত্রিপুরা বর্তমানে তার এলাকার বেকার মহিলাদের মাশরুম চাষ এবং মাশরুম এর বীজ উৎপাদনের উপর হাতে কলমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এতে এলাকার বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। এই দম্পতি পাহাড়ি এলাকার আদর্শ। একটা সময় ছিল খাগড়াছড়িতে মানুষের মধ্যে মাশরুম চাষে তেমন আগ্রহ ছিলো না। এখন খাগড়াছড়িতে মাশরুম এর বাজার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন তারা পাঁচ থেকে ছয় কেজি মাশরুম উৎপাদন করছেন। এক কেজি মাশরুম এর স্থানীয় বাজার মূল্য চার শত টাকা। মাশরুম চাষ এবং মাশরুম এর বীজ উৎপাদন ছাড়াও তাদের একটি মুদি দোকান রয়েছে। এই দোকানে মাশরুম ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই ত্রিপুরা দম্পতির মাসিক আয় প্রায় এক লক্ষ টাকা। তাদের মাশরুম চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একটা সময় তাদের কোন অর্থ ছিল না, কিন্তু এখন মাশরুম চাষ এবং দোকানে বিনিয়োগ করেছেন প্রায় দশ লক্ষ টাকা। তাদের স্বপ্ন তিন পার্বত্য জেলায় মাশরুম এর চাহিদা পূরণ করে সারা দেশে রপ্তানি করবেন।

মাশরুম চাষ এবং মাশরুম এর বীজ উৎপাদন কাজে এই দম্পতি পাঁচ জন লোকের নিয়মিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। তাদের বেতন ৬ থেকে ৯ হাজার টাকা। এছাড়াও তাদের সাথে খন্ডকালীন কাজ করেন আরো পাঁচ জন কর্মী। পাহাড়ি এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। তারপরও তাদের পরিকল্পনা আছে আরো অনেক পাহাড়ি বেকার ছেলে-মেয়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার। যশু ও নিপু ত্রিপুরা দম্পতি অনেক সেবা মূলক কাজের সাথেও সম্পৃক্ত। তারা দুজন খুব বেশি দূর পড়ালেখা করতে না পারলেও স্বপ্ন দেখেন সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার। এই দম্পতির দুই কন্যা সন্তান। একজন দশম শ্রেণির ছাত্রী, আরেক জনের বয়স তিন বছর।

পরিশ্রমে সফলতা আসে তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই ত্রিপুরা দম্পতি। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস তাদের সফলতা এনে দিয়েছে। সমাজে তাদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ তারা প্রতিষ্ঠিত। বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এই দম্পতি এখন স্বাবলম্বী। আমরা এই দম্পতির সফলতা কামনা করি।■

● সহকারী কর্মকর্তা- প্রশিক্ষণ
বুরো বাংলাদেশ
মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।

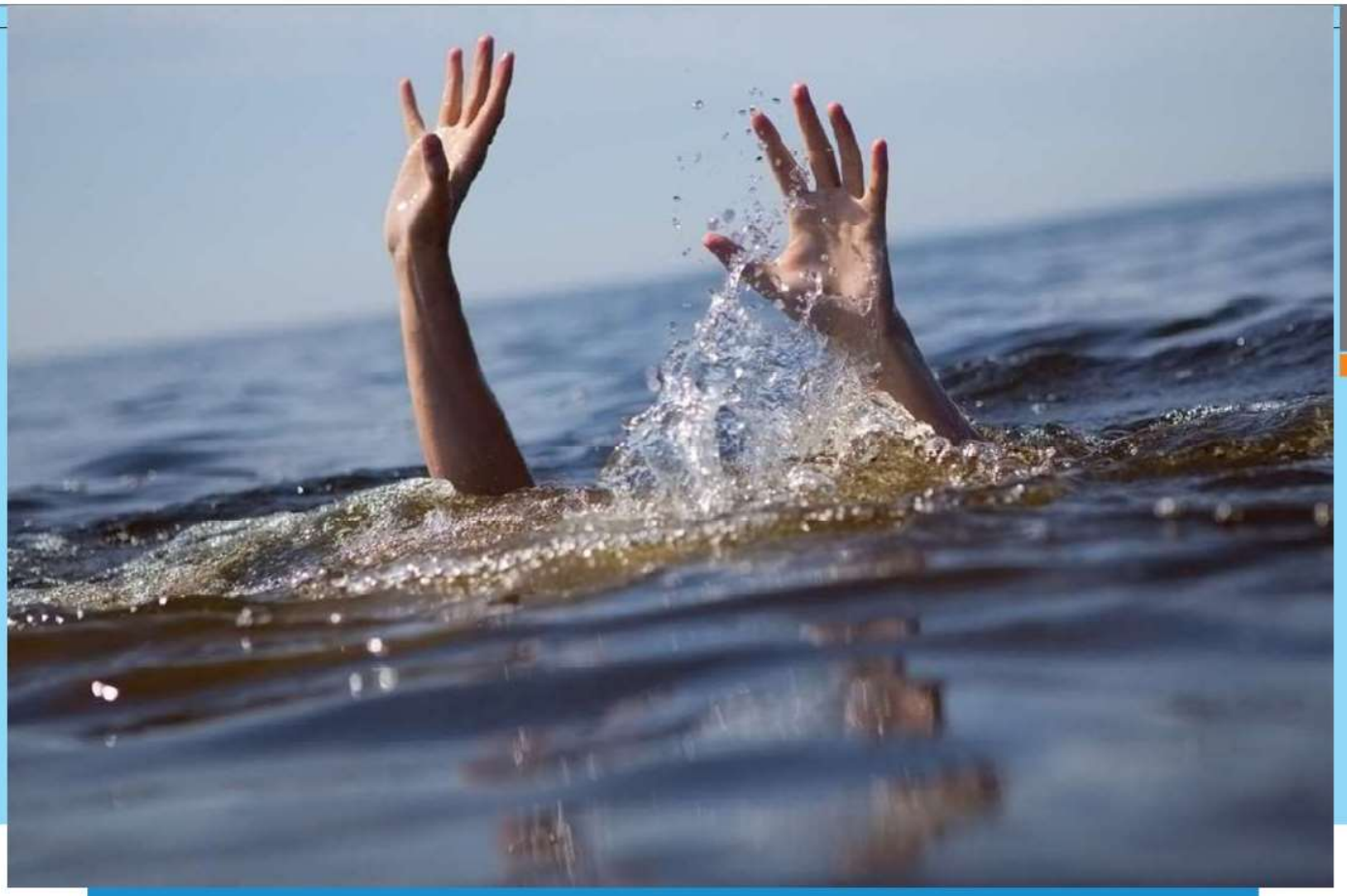

বাংলাদেশের প্রস্তাবে ২৫ জুলাই বিশ্ব 'পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ' দিবস

ইউনিসেফের সহযোগিতায় পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৯ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। এই জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন ৫ বছরের কম বয়সী ৩০ জন শিশু পানিতে ডুবে মরা যায়। গত দেড় বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ ধরনের মৃত্যু সবচেয়ে বেশি ঘটে কুড়িগ্রাম জেলায়।

পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ করতে আমরা–

- ছোট শিশুকে সবসময় চোখে চোখে রাখবো এবং খোলা পানির ধারে তাকে একা যেতে দিবো না।
- বাড়িতে পানি ভরা বালতি সবসময় ঢেকে রাখবো।
- বাড়ির চারপাশের অপ্রয়োজনীয় গর্ত কিংবা ডোবা ভরাট করে ফেলবো।
- সন্তানদের সাঁতার শেখানো।

যে কেউ পানিতে ডুবে যেতে পারি। আসুন সবাই মিলে সচেতনতা, শিক্ষা, তদারকি, প্রশিক্ষণ এবং জরুরি প্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা এই নীরব ঘাতককে প্রতিরোধ করি।

ডুবে যাওয়া শিশুকে উদ্ধারের সাথে সাথে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। এ সময় কোনভাবেই–

- তাকে মাথায় নিয়ে ঘোরানো যাবে না।
- পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করার চেষ্টা করা যাবে না।
- ছাই বা লবণ দিয়ে শরীর ঢাকা যাবে না।
- বমি করানোর চেষ্টা করা যাবে না।

এস এম এ রকিব
অ্যাসিটেন্ট কো-অর্ডিনেটর
বিশেষ কর্মসূচি বিভাগ, বুরো বাংলাদেশ

ডেঙ্গু সচেতনতা

নোশন তারান্নুম

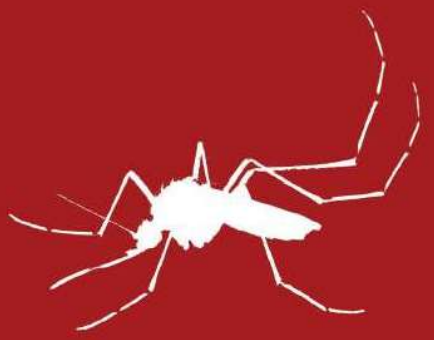

ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ যার জীবানু এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে মানবদেহে ছড়ায়। আসুন ডেঙ্গু সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেই।

ডেঙ্গু জ্বরের সময়কাল

সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থাকে কারণ এই সময়েই এডিস মশা বিস্তার ঘটায়। এডিস মশা সাধারণত সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার কিছুটা আগে তৎপর হয়ে ওঠে। এ মশা অন্ধকারে কামড়ায় না।

ডেঙ্গু জ্বরের ৬টি লক্ষণ

জ্বর, মাথা ব্যাথা, হাড়, পেশী বা গাঁটে ব্যাথা, বমি, চোখ ব্যাথা, চামড়ায় লালচে দাগ বা র‍্যাশ।

লক্ষণ দেখা দিলে করণীয়

জ্বরে আক্রান্ত হলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবনের মাধ্যমে অথবা প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীকে সাধারনত ঔষুধ সেবনের পাশাপাশি পরিপূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার যেমন: ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস, খাবার স্যালাইন গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

ডেঙ্গু জ্বর হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষুধ খাওয়া যাবে কিন্তু শরীর ব্যাথার জন্য অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষুধ খেতে নিষেধ করা হয় কারণ এতে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে।

ডেঙ্গু হতে নিরাপদ থাকতে করণীয়

১. এডিস মশা স্বচ্ছ পানিতে ডিম পাড়ে। সেজন্যে কোন পাত্রে, বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় রাখা গাছের টবে, বাড়ির আশেপাশে ও রাস্তায় পড়ে থাকা টায়ার, বোতল, ডাবের খোসা বা ময়লার ড্রামে এবং নির্মাণাধীন ভবনের বিভিন্ন স্থানে ২-৩ দিনের বেশি পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না।

২. দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজনীয় পানি শুষ্কস্থানে ঢাকনাসহ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. বাড়ির আশেপাশে পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

৪. নিয়মিত মশারী টানিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে।

৫. মশা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের মশার স্প্রে, ক্রীম এবং ইলেকট্রিক ব্যাট পাওয়া যায়, এগুলো পণ্যের গায়ে লেখা নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যহার করতে হবে।

৬. ডেঙ্গুর প্রতিরোধমূলক উপায়গুলো পরিচিতজনদের জানাতে হবে।

একজন ব্যক্তি কয়বার ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে?

যে কোন ব্যক্তি একাধিকবার ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই ডেঙ্গু প্রতিকারের চেয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

আসুন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে সরকারকে সর্বাত্মক সহোযোগিতা করি এবং সুস্থ থাকি।

লেখক : উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, এইচআরএম
বুরো বাংলাদেশ

‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’
‘ক্ষুদ্রঋণ : সামাজিকপুঁজি ও মানব উন্নয়নের কাজ’-এর ইতিবৃত্ত

আহসানুল হক

ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম– সিডিএফ, ‘ক্ষুদ্রঋণ’কে সংজ্ঞায়িত করেছে এই বলে যে, ‘ক্ষুদ্রঋণ : সামাজিক পুঁজি ও মানব উন্নয়নের কাজ’। ‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে কর্মরত সংগঠক ও কর্মীদের সেই মানবিক কাজের ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে।

১৯৭১-এ একটি সশস্ত্র ও সুসংগঠিত হানাদার শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে– তুলনায় বলা যায়– প্রায় নিরস্ত্র জনযোদ্ধারা যে অদম্য সাহসে যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে– সে সংগ্রাম তুলনা রহিত। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ সেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ঠেলে দেয় আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে। সে যুদ্ধ যুদ্ধপীড়িত, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সে যুদ্ধে অংশ নেন রণাঙ্গন থেকে ফেরা জনযোদ্ধারাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ স্বাধীনতার পরপরই বন্যা ও দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাব্রতী ত্রাণকর্মীরা স্বাধীন দেশের বিপন্ন মানুষের মাঝে ত্রাণ পৌঁছে দিতে গিয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন যে, সাময়িক ত্রাণে পরিত্রাণ মেলে না দারিদ্র্যের সার্বিক রাহুগ্রাস থেকে।

সংবেদনশীল এই স্বেচ্ছাব্রতীরা সমাধানের পথের সন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত করেন। তাঁরা কমবেশি সবাই স্ব স্ব অবস্থানে স্ব স্ব অভিজ্ঞতায় আবিষ্কার করেন যে, দুর্যোগ-দুঃসময়ে সামান্য অর্থও অসামান্য ভূমিকা রাখে– দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দুর্দশামুক্ত করতে। এদেশের মানুষের সৃজনশীল শ্রমশক্তি যুক্ত হলে তা যেমন ফলপ্রদ হয় তেমনই তাকে দুঃসময় উত্তরণে সহায়তা করে– এ সত্যও তাঁরা উপলব্ধি করেন।

এভাবেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের অসাধারণ ধারণাটির সূচনা তথা ক্ষুদ্রঋণের জন্ম। ‘ক্ষুদ্রঋণ’কে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটে দেশের হতদরিদ্র মানুষদের। তারা ধীরে ধীরে সাবলম্বী হয়ে ওঠেন। তারা নিজেরা যেমন নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান একই সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করেন সঙ্গীসাথীদের।

ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম- সিডিএফ– ক্ষুদ্রঋণের সেই উন্নয়নমুখী ভূমিকাকে সুসংহত এবং সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করা সেক্টরের বেশিরভাগ স্বীকৃত সংস্থাগুলোকে নিয়ে দেশের প্রথম ও একমাত্র ফোরাম- সিডিএফ তার জন্মলগ্ন থেকে ‘ক্ষুদ্রঋণ’কে জনমুখী, জনকল্যাণমুখী জনবান্ধব ও উন্নয়নমুখীকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করে চলেছে। এ কাজে সিডিএফ-কে সার্বিক সমর্থন জুগিয়েছে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বড়-ছোট সমস্ত সংগঠন। ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএসসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তাই ‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’ বইটিতে শুধু সিডিএফ-এর ইতিহাসই নয়, ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ইতিবৃত্তও বর্ণিত হয়েছে।

২.

সিডিএফ ক্ষুদ্রঋণের সমস্যা-সম্ভাবনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, তহবিলের সংস্থান– বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে চলেছে। সেক্টরের জন্য দক্ষ কর্মী, কর্মকর্তা ও নির্বাহীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে চলেছে। দেশে এবং দেশের বাইরে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর মধ্যে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে অবদান রাখছে।

‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’ এই গ্রন্থে সিডিএফ-এর পঁচিশ বছরের পথরেখা তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ক্ষুদ্রঋণসহ ঋণ কার্যক্রমে নিবেদিত সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং অংশগ্রহণ আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আমাদের ধারণা। সেই ভূমিকাকে ইতিবাচক এবং অর্থবহ করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের অগ্রগণ্য নেতৃবৃন্দ। সিডিএফ সেই লক্ষ্যে তার কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করে তোলায় সচেষ্ট।

ক্ষুদ্রঋণ এদেশের হতদরিদ্র মানুষদেরকে শুধু ‘বাঁচতে শেখা’র পথই দেখায়নি, তাঁদেরকে ‘জীবন জয়ের পথে’ও অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছে। ‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থটি সেই ইতিবাচক অগ্রযাত্রায় ‘একটি সূচনা’ মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি এই ‘সূচনা’ সেক্টরের কর্মে নিবেদিতদেরকে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অবদান তুলে ধরার প্রয়াসে প্রেরণা জোগাবে।

বইটি রচনা করেছেন সম্মিলিতভাবে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে সুদীর্ঘ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সুখেন্দ্র কুমার সরকার, এম. মোশাররফ হোসেন, মো. আবদুল আউয়াল এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক শুচি সৈয়দ।

‘সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত’ : লেখক- সুখেন্দ্র কুমার সরকার, এম. মোশাররফ হোসেন, মো. আবদুল আউয়াল ও শুচি সৈয়দ। বইটির সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী হিরণ্ময় চন্দ। প্রকাশক : আলোঘর প্রকাশনা, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৮, মূল্য : ২৫০ টাকা।

পুঁজিবাজারে বুরো বাংলাদেশ

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর (NGO-MFI) দীর্ঘ প্রত্যাশিত পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি গত ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পর্যায়ে তিনটি সংস্থা– বুরো বাংলাদেশ, ব্র্যাক এবং সাজেদা ফাউন্ডেশনকে পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে বন্ড ইস্যু করার জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদান করেন। কোভিড-১৯ এর বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে এ উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। উপরের ছবিতে বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করছেন প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, সাথে আছেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (অর্থ) এম. মোশাররফ হোসেন।

এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন লীড অ্যারেঞ্জার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হেড অব ক্যাপিটাল মার্কেট এর নির্বাহী পরিচালক মো. মারুফ উর রহমান মজুমদার, এমআরএ'র নির্বাহী পরিচালক লক্ষণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক মো. নূর আলম মেহেদী। ব্র্যাক ও সাজেদা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করেন সংস্থা দু'টির প্রধান নির্বাহীগণ।

বুরো বাংলাদেশ ও ঢাকা ব্যাংকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

বুরো বাংলাদেশ ও ঢাকা ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নিতে সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে আসেন ঢাকা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ইমরানুল হক, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হেড অব সিন্ডিকেশন অ্যান্ড স্ট্রাকচার্ড ফাইন্যান্স মো. মনিরুল আলম এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ইনচার্য-এগ্রিকালচার ব্যাংকিং ইউনিট মো. কাতেবুর রহমান। এ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম. মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক-অপারেশনস ফারমিনা হোসেন এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়কারী আবদুল হালিম।

বুরো বাংলাদেশের কোভিড-১৯ সহায়তা কার্যক্রম

২০২১ সালেও সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশকেও এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়েই সরকারকে লকডাউনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। লকডাউনের কারণে ও জীবন বাঁচানোর তাগিদে মানুষ ঘরে অবস্থান করেছে। শিল্প কারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও গণপরিবহন বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের আয়-রোজগারের পথ বহুলাংশে সীমিত হয়ে পড়ে। এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ।

স্বাস্থ্য ও খাদ্য ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হওয়া মানুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। সরকারের সেই আহ্বান ও এমআরএর সার্কুলার-৫৫ প্রতিপালন করে বুরো বাংলাদেশ ২০২০ সাল থেকেই দেশব্যাপী খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু করে এবং এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম ২০২১ সালেও চলমান রয়েছে। মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার বুরো বাংলাদেশের এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। শুধু খাদ্যই নয়, ফেস মাস্ক ও হাত ধোয়ার জন্য তরল সাবানও এই সহায়তার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে বুরো বাংলাদেশ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পিপিই, আইসিইউ কার্ডিয়াক মনিটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ডাক্তার ও

নার্সদের জন্য এন-৯৫ মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, বুরো তার প্রতিটি শাখার কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে মাস্ক, গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে। একই সাথে জনসাধারণের জন্য অনলাইনে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচি বুরো বাংলাদেশ দেশব্যাপী সফলভাবে পরিচালনা করেছে।

নিজস্ব অর্থায়ন ও উদ্যোগের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশ ইস্টার্ন ব্যাংক ও রূপালি ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বাস্তবায়নেও সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যেই ইস্টার্ন ব্যাংকের অর্থায়নে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা সদর ও সালটিয়া ইউনিয়নে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ১১৬০ পরিবার এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার চিনাভুলি ইউনিয়নের ৮৪৫টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ছিলো– চাল ২৫ কেজি, আলু ৫ কেজি, ডাল ২ কেজি, তেল ২ কেজি, লবণ ১ কেজি। গফরগাঁও উপজেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারমঅ্যান আসরাফ উদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন গফরগাঁও পৌর মেয়র এস এম ইকবাল হোসেন, গফরগাও উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাজুল ইসলাম। জামালপুরে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামপুর উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম জামাল আব্দুন নাছের এবং সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মাজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানগুলোতে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি সমন্বয়কারী খন্দকার মুখলেছুর রহমান লিটন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (টাঙ্গাইল) হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ময়মনসিংহ) আরিচ হোসেন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (মধুপুর) জহিরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্মকর্তাবৃন্দ। অপর দিকে রংপুর পৌরসভা ও তারাগঞ্জ উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে রূপালি ব্যাংকের অর্থায়নে অনরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে বুরো বাংলাদেশ। মোট ১৫০০টি পরিবার এ কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা লাভ করে। রংপুর সদরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আসিব আহসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. গোলাম রব্বানী, সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মোকলেসুর রহমান টিটু, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এটিএম আক্তারুজ্জামান। তারাগঞ্জে উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আনিসুর রহমান লিটন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আফজালুল হক সরকার, পূবালী ব্যাংক-রংপুর এর ডিজিএম মো. কামরুজ্জামান এবং ব্যাংটির সৈয়দপুর শাখার ম্যানেজার মো. রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানগুলোতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (রংপুর) মো. আব্দুস সালাম এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (রংপুর) মো. বাহাদুর আলমসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্মকর্তাবৃন্দ।■

পূর্ব ও দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কোলাহলমুক্ত এক জনপদ। মনিপুরী, মাতৈ, বিষ্ণুপুরী, খাসিয়া ও গারো আদি নিবাসীদের বসবাস এখানে। বলছি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কথা। এখানকার ২৪টি গ্রামের একটি পূর্বকোণা গাঁও। গ্রামটি মনিপুরী প্রধান।

গুলশান আরা চৌধুরী এ গ্রামেরই একজন উদ্যোক্তা। নিজ চেষ্টায় সচল রেখেছেন পূর্বপুরুষের নিপুণ যন্ত্রকৌশল। নিজেই তৈরি করেন শাড়ি, শতরঞ্জি, চাদর, ব্যাগ ও ওড়না। সবই মনিপুরী ঐতিহ্যের। এ পণ্যগুলোর বেশ বাজার চাহিদা রয়েছে এপার এবং ওপারেও। গুলশান আরা বুরো বাংলাদেশের গ্রাহক হয়েছেন বছর তিনেক হয়েছে। বুরোর আর্থিক সেবা ও কর্মীদের সহযোগিতার মনোভাব দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিলো তাকে। বুরো থেকে কয়েকবার ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন তিনি। তার ইচ্ছা, আরো বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে বড় করবেন তার উদ্যোগের পরিসর, কর্ম সংস্থান করবেন আরো কয়েকজন কারিগরের। দেশে ও বিদেশে প্রসারিত করবেন তার তৈরি পণ্যের বাজার। গুলশান আরা'র এই স্বপ্নের বাস্তবায়নে পাশে থাকবে বুরো বাংলাদেশ।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

এপ্রিল-জুন ২০২১ • সংখ্যা-২৫ • বর্ষ-৬